অতিমানস-দিশারী শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীরঘুনন্দন দাস

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী-২

প্রকাশক : শ্রীসত্য বসু
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ : ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫৩

প্রচ্ছদপট : অল ইণ্ডিয়া প্রেস
পণ্ডিচেরী-২

মুদ্রক : শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১নং পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমাতৃবন্দনম্*

(লঘুগুরুচ্ছন্দঃ)

বন্দে শ্রীঅরবিন্দং, মীরাং ব্রহ্মময়ীং শ্রীমাতরম্ ।

বন্দে মহীং সসাগরাং বৈ বিপুলাং পৃথ্বীং চিত্তহরাম্ ।
তদ্ধাতারং সততং বন্দে হরিং কৃপাবতারবরম্ ॥১

বিরাজতে অন্তিকে হি যস্য সুহাসিনী পরমা মাতা ।
প্রেমরসাপ্লুত নেত্রং বন্দে নিত্যং তং শুভ্রাম্বরম্ ॥২

শ্রীপদপঙ্কজ ধ্যানাদ্ যস্য দেবায়তে খলু সাধকঃ ।
হিংসালোভমোহহারিণং বন্দে শান্তং সৃষ্টিধরম্ ॥৩

পরাচেতনাদাতা যো ভবতি যুগে যুগে অবতীর্ণঃ ।
অধর্মধ্বান্তধ্বংসকারিণং বন্দে চ পরমেশ্বরম্ ॥৪

ধ্রুবং জায়তে অবলোক্য যং দিব্যানন্দো রমণীয়ম্ ।
মুচ্যতে সর্ববন্ধনাৎ দৃষ্ট্বা তং নরো বিশ্বম্ভরম্ ॥৫

আবির্ভাবদিবসে তস্য দেশজননী পাশবিমুক্তা ।
ভেদনাশিনী তস্য বাণী, নৌমি পুনস্তং শুভঙ্করম্ ॥৬

যস্য শক্তির্মহাকালী সহর্ষং নৃত্যতি রণাঙ্গনে ।
তমেব পুরুষোত্তমং বন্দে পরমং পূর্ণং পরাৎপরম্ ॥৭

স গোপঃ নৈব চ গোপ্যঃ বাদয়তে হৃদি মধুর বেণুম্ ।
লজ্জাকুলহর্তারং বন্দে ভীষণং তং মনোহরম্ ॥৮

---

* শ্রীঅরুণেন্দু নন্দী-বিরচিত

—গ্রন্থকার

উৎসর্গ

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণকমলে

নিবেদন

ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত
শ্রীঅরবিন্দের অবদানের বিষয়ে ইতিহাসের উপেক্ষা

পরাৎপর পরমেশ্বর স্বয়ং যুগধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীঅরবিন্দরূপে এই ধরাধামে, পুণ্য ভারতভূমিতে হলেন অবতীর্ণ।—সম্পূর্ণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-স্বপ্নকে। ভারতের বিদেশী-শৃঙ্খল মুক্তির জন্য, পৃথিবীর দিগ্‌ভ্রান্ত, অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মানবকুলকে শ্রেয়ের পথে, ঐক্য এবং শান্তির পথে পরিচালনার জন্য, এক নূতন আলোকের প্রতি দৃষ্টি-উন্মোচনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব; সমগ্র জগতের মানব-সমাজের অধ্যাত্মমুক্তি তাঁর ব্রত। শ্রীঅরবিন্দ এসত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগতের অধ্যাত্মমুক্তি-সাধনের জন্য ভারতবর্ষ নিয়তি-নির্দিষ্ট হ'য়ে আছে। কিন্তু ভারত যতদিন পরপদানত হ'য়ে থাকবে ততদিন তার পক্ষে এই সুমহান ব্রতসাধন সম্ভবপর হবে না!—জগদ্বাসীর অধ্যাত্ম-মুক্তি-সাধনের পূর্বে ভারতের পরাধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্তি সাধন অতি অবশ্য প্রয়োজন। এ-সত্য শ্রীঅরবিন্দ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেন বিলাত-প্রবাসে তাঁর ছাত্র-জীবনে কিশোর বয়সেই। তাই আঠারো বৎসর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ কয়েকজন ভারতীয় যুবকের সহিত ইংলণ্ডেই এক গোপন সভায় ভারত-জননীর শৃঙ্খলমুক্তির শপথ গ্রহণ করেন। তাঁরা ঐ Secret Societyতে সেদিন সঙ্কল্পবদ্ধ হন যে, ভারতে ফিরেই তাঁরা আন্দোলন শুরু করবেন ভারত-বাসীর প্রাণে স্বাধীনতাস্পৃহা জাগিয়ে তুলতে জীবন পণ ক'রে।

তাই সুদীর্ঘ চোদ্দ বছর পরে বিলাত-প্রবাস থেকে শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরেই লেখনী ধারণ করেন ভারতবাসীকে আত্মসচেতন ক'রে তুলবার জন্য, তাদের অন্তরে স্বাধীনতা-চেতনা জাগিয়ে দেবার জন্য। পরবর্তী-কালে তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে সমগ্র ভারতকে যেভাবে স্বাধীনতা-মন্ত্রে জাগিয়ে তোলেন, ইতিহাস আজ তা' বিস্মৃত।

আমি সেদিন, কিশোরদের জন্য রচিত একটি ইংরাজী ইতিহাসে দেখলাম বহু রাজনৈতিক নেতাদের কর্ম এবং তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাস তাতে রয়েছে, যথা—তিলক, গোখলে, দাদাভাই নৌরজী, মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি। পৃথক্-পৃথক্ পরিচ্ছেদে এঁদের পরিচয় উক্ত ইতিহাসে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কার্যাবলীর কোনো পরিচয় তাতে নেই। একটা জায়গায় এক প্যারাগ্রাফের মধ্যে দেখলাম শুধু লেখা আছে : (স্বদেশীযুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিষয়ে)--"A leader of this fight was Aurobindo Ghosh, who later became a sannyasi"...এই ইতিহাস পাঠে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃত অবদান বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুই জানতে পারবে না। বরং "who later became a sannyasi"—শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে ইতিহাসের এই মন্তব্যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের মনে এই ধারণাই জন্মাবে যে, স্বদেশীযুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি নেতৃত্ব করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি সন্ন্যাসী হ'য়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন।

স্বদেশীযুগে ইংরাজী দৈনিক "বন্দেমাতরমের" মাধ্যমে যে শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিবাণী ভারতের সব প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রথম স্বাধীনতামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করলো,—তিলকের সঙ্গে এক মত হ'য়ে যে শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে জাগিয়ে তুললেন স্বাধীনতালাভের অদম্য প্রেরণায়! ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেস-অধিবেশনে যে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের মডারেট নেতাদের মতলবকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে কংগ্রেসকে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পথকে সুগম ক'রে দিলেন,—ভারতের ইতিহাস প্রণেতাগণ সেই শ্রীঅরবিন্দের সুমহান্ অবদানের বিষয় আজ যেন ইচ্ছা ক'রেই ভুলে যাচ্ছেন। সত্যের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদানে তাঁরা সব জেনে-শুনেও পরাঙ্মুখ। যে দেশ এবং যে জাতি তার দেশের জাগ্রত সত্যকে অস্বীকার করে, ভুলে যায় তার যুগ-পুরুষের মহিমা ও অবদানকে, সে-জাতি এবং সে-দেশকে তার ফল ভোগ করতেই হয়। শ্রীঅরবিন্দের সুমহান্ অবদানকে এবং ভারতের মঙ্গল বিষয়ে তাঁর নির্দেশকে অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যানের ফলেই ভারতের আজ এই চরম দুর্দশা ও দুর্ভোগ। ভারত আজ ভারত-বিরোধী শক্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত! তবুও ভারতের অবতার-পুরুষদের কর্ম এবং তপস্যার ফলেই ভারত তার চরম বিনষ্টি থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতবাসী যদি চিরদিনই তার সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তবে তাদের চরম বিনষ্টি তারা নিজেরাই ডেকে আনবে। তাই আমাদের অবতার এবং মহাপুরুষগণ আমাদের সাবধানবাণী শুনিয়ে গেছেন আমাদেরই মঙ্গলের জন্য ;--সত্যকে স্বীকার ক'রে, সেই সত্যের নীতিতে আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে গ'ড়ে তোলার জন্য। আর এই কাজ করতে গেলে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ এবং লোকমান্য তিলককে আমাদের চেতনায়

চির-জাগ্রত রেখে চলতে হবে, তাঁদের অবদানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে মহা পাপের পাতকী হ'তে হবে জাতিকে।

যে-দেশনেতাগণ শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ এবং নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ভারত-বিরোধী শক্তির প্রতি তোষণনীতি আচরণদ্বারা ভারত-জননীর দেহকে খণ্ডিত ক'রে ভারতের সর্বনাশ সাধন করলেন, তাঁদেরই গুণকীর্তনে ইতিহাস আজ মুখর !

যে-শ্রীঅরবিন্দ জাতির চেতনায় স্বাধীনতা-স্পৃহাকে বদ্ধমূল ক'রে দিয়ে প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে পণ্ডিচেরী-সাধনক্ষেত্রে তপস্যামগ্ন হলেন যোগশক্তিদ্বারা ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য, ব্রিটিশের মনোভাবের পরিবর্তন সাধনের জন্য এবং তাতে তিনি সফলকামও হলেন,—১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ক্রীপস্-প্রস্তাব প্রেরণ যার ফল, সে-শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেশ কর্তৃক আজ উপেক্ষিত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগদৃষ্টিতে এ সত্য প্রত্যক্ষ করেন যে, ব্রিটিশের সেই ক্রীপ্স্ প্রস্তাব প্রেরণের পশ্চাতে ব্রিটিশের সদিচ্ছা রয়েছে—সে আন্তরিক ভাবেই চায় ভারতের সঙ্গে চির-বন্ধুত্বভাব বজায় রেখে, যুদ্ধ শেষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতের স্বাধীনতা অর্পণ ক'রে ভারত ছেড়ে চলে যেতে। শ্রীঅরবিন্দ এসত্য উপলব্ধি ক'রে সুদীর্ঘ ত্রিংশ বৎসর পরে ভারতের রাজনীতিতে পুনরায় হস্তক্ষেপ করেন। ঐ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ দিল্লীতে গান্ধীজীর কাছে স্বীয় দূত মারফতে নির্দেশ পাঠান: বিনা সর্তে ব্রিটিশ-প্রেরিত সেই ক্রীপ্স-প্রস্তাব গ্রহণ করতে—ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে—ভারতের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু গান্ধীজী-প্রমুখ ভারতের দেশ-নেতারা শ্রীঅরবিন্দের সেই দিব্য নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ভারতের চরম ক্ষতি সাধন করলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহায়তালাভে বঞ্চিত হ'য়ে এবং ভারতের অপর সম্প্রদায়ের সহযোগিতালাভের প্রতিশ্রুতি পেয়ে, তাদের অনুরোধে এবং স্বীয় স্বার্থে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থনে, ভারতের দেহকে খণ্ডিত ক'রে ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে হল ভারতকে খণ্ডিত স্বাধীনতা দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশকে মেনে নিয়ে আমাদের দেশ-নেতারা যদি তখন ব্রিটিশের ক্রীপ্স্-প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তবে ভারত বেঁচে যেতো তার দেশ-বিভাগরূপ মহা অনর্থ থেকে। তবুও, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর তপঃশক্তিবলে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে এলেন স্বীয় আবির্ভাব-দিবস ১৫ই আগস্ট তারিখে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কিন্তু ভারতকে স্বাধীনতা দেবার দিন ধার্য করে রেখেছিল

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। -ইতিহাসের উক্তিতে এই দিব্যপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ কিনা "became a sannyasi"? এই ইতিহাস প'ড়ে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের যথার্থ অবদান-বিষয়ে কিছুই জানতে পারবে না। —"who later became a sannyasi" উক্ত ইতিহাসের এইরূপ মন্তব্যে ভারতের মুক্তিদাতা দিব্যপুরুষ শ্রীঅরবিন্দকে নিদারুণভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। উক্ত ইতিহাস—"Children's History of India—sheila Dhar—প্রকাশ হয়েছে 'Ministy of Information and Broadcasting Govt. of India কর্তৃক, 4th edition 1965, page 123.

ভারত সরকার যদি স্বয়ং তাঁদের প্রকাশিত ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দকে এই ভাবে অবজ্ঞা করেন তবে অন্যে পরে কা কথা।—আশা করি উক্ত ইতিহাসের পরবর্তী সংস্করণে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের মূল্যবান অবদানের বিষয়ে সত্য কথা প্রকাশ করা হবে বিশদভাবে।

এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ অবদানের বিষয়ে বর্তমান ভারতের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ! মনে হয় তাঁরা ইচ্ছা ক'রেই শ্রীঅরবিন্দকে উপেক্ষা করে চলেছেন গূঢ় উদ্দেশ্যে।

মোটামুটিভাবে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কর্মের, ভারত-জননীর শৃংখল-মুক্তি-আন্দোলনে তাঁর বিশেষ অবদানের বিষয়ে সব দিক বাঙালির মনে ধরিয়ে দেবার জন্য এই গ্রন্থের অবতারণা। তাঁর অতিমানস-সিদ্ধি অর্জনের বিষয় তাঁর জাতি যদি সম্যক্ উপলব্ধি করতে নাও পারে তবে এই গ্রন্থপাঠে তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিশদ পরিচয় পেয়ে বাঙালী বুঝতে পারবে—যুবক শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেশ-জননীর পরাধীনতা-শৃংখলমুক্তির জন্য কী করেছিলেন নিজের জীবন, ধন-মান এবং পদমর্যাদাকে উপেক্ষা ক'রে।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধ এবং বিষয়গুলি গত ১৯৫৫খ্রীস্টাব্দে "হিমাদ্রি" সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়েছিল। উহা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে বহু নূতন বিষয়ও সংযোজিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে "হিমাদ্রির" সব সংখ্যাগুলি পাঠ ক'রে "অতিমানস-দিশারী শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। এতদিনে দু'একজন বন্ধুর এবং আত্মীয়-স্বজনের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হ'ল। আশা করি মা-শ্রীঅরবিন্দ-অনুরাগী ভক্তগণ এই পুস্তকপাঠে আনন্দিত এবং উপকৃত হবেন। ইতি -

শ্রীরঘুনন্দন দাস

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেই মহারাষ্ট্রে স্বদেশব্রতী যুবকবৃন্দ কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে গৃহীত।

কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দ-জয়ন্তী সভায় এক মঠের শঙ্করাচার্যের উক্তি

আমাদের সতীর্থ বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ১৯৫২ সালে একবার কলকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর বাসায় তিনি একদিন দক্ষিণ-কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শ্রীঅরবিন্দ-জয়ন্তী উৎসবের একটি নিমন্ত্রণপত্র পান। পত্রে উল্লেখ ছিল উক্ত সভায় সারদা মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রীঅরবিন্দ-বিষয়ে ভাষণ দিবেন। পত্রটি পেয়ে নলিনীদা'র মনে বেশ কৌতুহল জাগলো: শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে শ্রীঅরবিন্দ প্রচণ্ডভাবে খণ্ডন করেছেন তাঁর দর্শনে এবং নানাবিধ রচনায়। সুতরাং সারদা-মঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে কী মন্তব্য প্রকাশ করবেন?—

নলিনীদা' তাঁর মনে এইরূপ প্রশ্ন এবং কৌতুহল নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। সভা আরম্ভ হবার কিছু পূর্বেই তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য তখনও এসে পৌঁছেননি। সভামণ্ডপের বহির্দেশে, রাজপথে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর আগমন আশায় প্রতীক্ষমাণ, নলিনীদাও সেখানে তাদের মাঝে উপস্থিত।— কয়েক মিনিট পরেই একটি মোটরকার শঙ্করাচার্যকে নিয়ে উপস্থিত হ'ল সভা-গৃহের ফটকের সামনে। শ্রীশঙ্করাচার্য মোটর থেকে নামলেন সন্ন্যাসীর দণ্ড-হাতে। তাঁকে তখন সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হ'ল সভাস্থলে। সভা-হলের এক প্রান্তে বক্তাগণের জন্য আসন নির্দিষ্ট ছিল, মধ্যস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্য রক্ষিত ছিল একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসন। শ্রীশঙ্করাচার্য যখন ভাষণ দিতে উত্থিত হলেন, নলিনীদারও হৃৎস্পন্দন উত্থিত হ'ল—শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে বক্তা কী বলেন, এই ভেবে। কিন্তু শঙ্করাচার্য শুরুতেই শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতার এবং শ্রদ্ধার বিষয় ব্যক্ত করলেন তাতে নলিনীদা বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হলেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁর ভাষণে প্রথমেই শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে বললেন—বাংলাদেশে বঙ্গসন্তানগণ যেমন শ্রীঅরবিন্দের উদাত্ত আহ্বানে একযোগে এবং সমস্বরে জেগে উঠেছিল স্বাধীনতাব্রতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, আমরা মারাঠী-যুবকরা মহারাষ্ট্রে তেমনিভাবে স্বরাজমন্ত্রে জেগে উঠেছিলাম তিলক মহারাজের আহ্বানে।—

তখন আমরা ব্রহ্মচারী যুবক, লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে আমরা স্বদেশব্রতী সাধক। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে গীতাপাঠ ছিল নিত্য অবশ্য পালনীয়। কিন্তু গীতাপাঠের সময় আমরা কি করতাম জানেন?—গীতায় যেসব অধ্যায়ে 'ভগবান উবাচ' লেখা আছে, সেই সব অধ্যায়ে 'ভগবান' শব্দটাকে কেটে আমরা 'অরবিন্দ' লিখতাম। অর্থাৎ 'ভগবান উবাচ' স্থলে আমরা 'অরবিন্দ উবাচ' করতাম। কারণ আমরা সেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেই জানতাম যে, শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন।—

শ্রীঅরবিন্দের প্রতি সে-যুগে মারাঠা-যুবকদের উক্তরূপ ভক্তি-বিশ্বাসের কথা শুনে সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী সেদিন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন।

সেই স্বদেশী-যুগে মহারাজ তিলক-শিষ্য মারাঠী-যুবকদের উক্তরূপ শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তি এবং বিশ্বাস সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ও সত্য।—ঠিক দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অত্যাচারী ও মহা অন্যায়কারী দুর্যোধনের এবং তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে তাঁর পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে পাণ্ডবদের এবং তাঁদের সহায়কারী বন্ধুদের একত্রিত করেছিলেন ন্যায় ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য, সেইরূপ ঘোর কলিযুগের কল্কি-অবতার শ্রীঅরবিন্দ বজ্রনির্ঘোষে "বন্দেমাতম্" মন্ত্রধ্বনিতে ভারতের তৎকালীন্ সব স্বদেশব্রতীদের একত্রিত করেছিলেন স্বদেশে ব্রিটিশ-শাসন এবং ব্রিটিশের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে।

শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষণে ব'লে চল্‌লেন :

"১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন শ্রীঅরবিন্দকে কলকাতার জেলে পুরলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী দেবী যখন অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন কোর্টে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সেই মামলা পরিচালনার জন্য। আমরা স্বেচ্ছাসেবকরা তখন মহারাষ্ট্রে কিছু অর্থ সংগ্রহ করলাম এবং সেই অর্থ কলকাতায় কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করবার জন্য আমরা দুইজন ভলাণ্টিয়ার কলকাতা গেলাম। কলকাতায় চৌরঙ্গী রোডের বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় আমাদের সংগৃহীত অর্থ প্রদান ক'রে আমরা তখন কলকাতায় থেকে যাওয়াই স্থির করলাম—কোর্টে বিচারপতি বীচক্রফটের এজলাসে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী এবং শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশের ওকালতি শুনবার জন্য, সর্বোপরি শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভের আশায়।...

চৌরঙ্গী রোডের অফিসে একদিন আমরা ব'সে আছি, এমন সময় একটা বেনামী খামের চিঠি সেখানে পেলাম। খামটা খুলে দেখি তার মধ্যে

কোনো চিঠি নেই, আছে দুটো টাইপকরা সীট। কাগজ-দুটো প'ড়ে বোঝা গেল : আইন সংক্রান্ত সব বিষয় তাতে আছে। আমরা তখন সেই টাইপকরা কাগজ-দুটো নিয়ে ছুটলাম নিকটেই ব্যারিস্টার সি আর. দাশের বাসায়। সেখানে গিয়ে তাঁর হাতে কাগজ-দুটো দিলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে টাইপকরা সীট-দুটো প'ড়ে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠলেন—"তোমরা আজ আমাকে এমন মূল্যবান জিনিষ নিয়ে এসে দেবে তা আমার কল্পনার অতীত। এই কাগজ-দুটো অরবিন্দের পক্ষে অনুকূল সব আইনের যুক্তিতে পূর্ণ। এইসব যুক্তিপূর্ণ আইন সংক্রান্ত বিষয় অরবিন্দের পক্ষে প্রতিপন্ন করতে কমপক্ষে আমাকে এক সপ্তাহ পরিশ্রম করতে হ'ত।···আমার বিশ্বাস : বিচারপতি বীচক্রফট্ তাঁর আই-সি-এস-এর সহপাঠী-বন্ধু এক্‌রয়েড অরবিন্দ ঘোষকে রাজশাস্তি হ'তে রক্ষার জন্যই অরবিন্দের পক্ষে অনুকূল এইসব আইন সংক্রান্ত বিষয় পাঠিয়েছেন বেনামীতে।—এ বিচারপতি বীচক্রফট্ ছাড়া আর কারো কাজ নয়।" ব্যারিস্টার দাশের ঐরূপ মন্তব্যে আমারও অন্তঃকরণ সায় দিল এবং আমরা উক্ত বিষয়ে তাঁর ঐ কথা শুনে আনন্দিত এবং পরিতৃপ্ত হলাম। শ্রীঅরবিন্দকে রক্ষার জন্য বিচারপতি বীচক্রফ্‌ট যে কী উপকার করেছিলেন তা বলা যায় না। এতেই বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর স্বয়ং বীচক্রফ্‌টকে পাঠিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সেই কেসের বিচারপতি ক'রে।

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে যখন উক্ত মামলা সমাপ্তির পথে এল। ব্যারিস্টার সি-আর-দাশ যখন তাঁর মামলা-সমাপ্তি বক্তৃতা শেষ করলেন, এ বক্তৃতা শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃত মহিমা বিষয়ে সি. আর. দাসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐতিহাসিক সত্যরূপে পরিচিত ; শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে যাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং নিখুঁত ওকালতির ফলে শ্রীঅরবিন্দ যখন সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রতিপন্ন হ'লেন, সেই সময় কোর্টে মিঃ বীচ-ক্রফ্‌ট্‌কে অভিনন্দন জানাবার জন্য আমরা চেষ্টা ক'রে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হলাম এবং তাঁর খুব কাছে গিয়ে অতি গোপনে তাঁকে বললাম—"আমরা আমাদের চৌরঙ্গী রোডের অফিসে বেনামীতে পাঠানো দুটো টাইপকরা সীট একটা খামে পেয়েছিলাম। আমরা কি অনুমান করতে পারি যে তার প্রেরক আপনিই ?"—আমাদের এই প্রশ্নে বীচক্রফ্‌ট্ মৃদু হেসেছিলেন মাত্র।···

আমরা জানি যে, শ্রীঅরবিন্দ-আধারে সক্রিয় সত্য এবং তাঁর মহিমা প্রথম প্রতিভাত হয়েছিল ঐ ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দেই বরোদা-কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল

মিঃ এ. বি. ক্লার্কের দৃষ্টিতে। শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা-কলেজের কর্ম ত্যাগ করলেন তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সি. আর. রেড্ডিকে মিঃ এ. বি. ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

"তা হ'লে আপনি অরবিন্দ ঘোষকে দেখেছেন ?—আপনি তাঁর চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করেছেন কি ?—জোনের আর্ক যদি স্বর্গীয় বাণী শুনে থাকেন তবে অরবিন্দের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় স্বর্গীয় দৃশ্যাবলী।" এবিষয়ে এই গ্রন্থের অবতরণিকায় আরও আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর কবিদৃষ্টিতে এ সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের মাধ্যমে বাগ্‌দেবী ব্রহ্মময়ী সরস্বতীর বাণীই ঝঙ্কৃত হ'য়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই উপলব্ধিগত সত্য প্রকাশ করেছেন: শ্রীঅরবিন্দ-উদ্দেশে-রচিত তাঁর সুবিখ্যাত 'নমস্কার' কবিতায়। এসত্য বাঙলা জানে। এই 'নমস্কার' কবিতা কবি তখন স্বয়ং আবৃত্তি ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে শুনিয়ে এসেছিলেন একটী ফিটন গাড়ী ক'রে শ্রীঅরবিন্দের কলিকাতাস্থ বাসভবনে গিয়ে।—রবীন্দ্রনাথের এই 'নমস্কার' কবিতা ঐতিহাসিক সত্য হ'য়ে রয়েছে। এই গ্রন্থের অবতরণিকায় কবিতাটি পূরো উদ্ধৃত করা হয়েছে।

লোকমান্য তিলক স্বয়ং সে যুগেই শ্রীঅরবিন্দকে ঈশ্বর-প্রেরিত অবতাররূপে চিনেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যগণ সে-সত্য জানতেন।—মহারাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবক-গণ সেই স্বদেশী যুগেই শ্রীঅরবিন্দকে যে স্বয়ং ভগবান বাসুদেবরূপে গ্রহণ করেছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়: ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সুরাট-কংগ্রেস অধিবেশনে।-সেখানে মডারেট নেতাদের তোষণমূলক এবং বদ্ধ নীতিকে ব্যর্থ করবার জন্য সুরাট কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙ্গে দেবার প্রয়োজনীয়তা যখন শ্রীঅরবিন্দ বোধ করেছিলেন তখন সেই মারাঠী স্বেচ্ছাসেবকদল তাঁদের নেতা তিলকের আদেশের অপেক্ষা না ক'রে কেবলমাত্র শ্রীঅরবিন্দের হুকুমেই একযোগে কংগ্রেস-সভামঞ্চ আক্রমণ ক'রে সেই কংগ্রেস অধিবেশন দিয়েছিলেন ভেঙ্গে।—কারণ মারাঠী-স্বেচ্ছাসেবকরা জানতেন: শ্রীঅরবিন্দের সেই হুকুম স্বয়ং ভগবান বাসুদেবেরই আদেশ। এবিষয়ে এই গ্রন্থের অবতরণিকায় বিশদ আলোচনা রয়েছে।

অতিমানস-দিশারী শ্রীঅরবিন্দ

এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

১। "পণ্ডিচেরীর পত্র" ... ... শ্রীঅরবিন্দ

২। "কারাকাহিনী" ... "

৩। "উত্তরপাড়া অভিভাষণ" ... .. "

৪। "শ্রীঅরবিন্দ -যোগ ও জীবন" .. ... প্রমোদ সেন

৫। "স্মৃতির পাতা" ... ... শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৬। "শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে" ... ... দীনেন্দ্রকুমার রায়

৭। "নির্বাসিতের আত্মকথা" ... ... উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। মৎপ্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ-চরিতামৃত"

৯। "গল্পভারতী"—শ্রীঅরবিন্দ-সংখ্যা

১০। "শ্রীমায়ের শতবার্ষিকী গ্রন্থ

১১। "Twelve years with Sri Aurobindo" ... নীরদবরণ

১২। "Sri Aurobindo and his Ashram

এবং আরো কতিপয় প্রবন্ধাদি

অবতরণিকা

এক

যুগ-প্রয়োজনে সত্যপথের দিশারীরূপে পরাৎপর পরমেশ্বর মানবশরীর ধারণ ক'রে এই পৃথিবীর বুকে যখন অবতীর্ণ হন, সীমিতবুদ্ধি মানুষ সহজে সেই অবতার-পুরুষকে চিনে নিতে পারে না। কদাচিৎ কোনো ভাগ্যবানের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায় এই নরদেহের অন্তরালে-প্রচ্ছন্ন অমরার সেই প্রদীপ্ত রূপ। অবতার-পুরুষের চলন-বলন, হাব-ভাব মানুষের গড়া সাধারণ নিয়ম কানুনের পর্যায়ে পড়ে না। শৈশব হ'তেই তাঁদের কথাবার্তায় এবং আচার-ব্যবহারে যেন একটা অনন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; মানুষেব সাধারণ বুদ্ধি শিশুর সেইসব ভাবের কোন হদিস পায় না—দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি ভাব-গুলোকে শিশুর সুলক্ষণের ভাব হিসেবে গ্রহণ ক'রে তাঁরা মনে আনন্দ পান মাত্র।···করুণাবতার বুদ্ধের শৈশব-জীবনে জীবের প্রতি তাঁর অসীম করুণার পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল—বাণবিদ্ধ হংসকে বাণমুক্ত ক'রে স্বীয় জীবন বিনিময়ে সেই হংসের জীবন রক্ষায় তাঁর অনমনীয় প্রতিজ্ঞার ভিতরে।··· শ্রীচৈতন্যের জীবনেও দেখা যায়—তৎকালীন সংস্কারাচ্ছন্ন শুষ্ক জ্ঞানধর্মী মানব-সমাজকে সংস্কারমুক্ত ক'রে শুদ্ধা ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত করবার জন্য তিনি যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা শিশু নিমাইয়ের সব হাব-ভাবে, কথাবার্তায় এবং সামাজিক নীতি-বিরুদ্ধ সব ক্রিয়াকলাপে ক্রমেই প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল;— শচীমাতা দুরন্ত নিমাইয়ের আচরণে অতিষ্ঠ হ'য়ে যখন তাঁকে ধরতে গেলেন, নিমাই অমনি ছুটে গিয়ে ব'সে পড়লেন—আঁস্তাকুড়ে পরিত্যক্ত অচ্ছুত মাটির হাঁড়ির উপরে!—নিমাই শৈশবে তাঁর এইরূপ অদ্ভুত আচরণের দ্বারা সমাজকে জানিয়ে দিলেন যে, ছুঁৎমার্গনীতি মানুষের মনের সংস্কার বই আর কিছুই নয়; সেই বালক-নিমাইয়ের মুখ থেকে তাঁর মায়ের উদ্দেশে তখন বাণী বেরিয়ে এল—"শুচি অশুচি শ্রীহরির পাদপদ্মে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেহে অবতীর্ণ হ'য়ে ভগবান এই পৃথিবীতে যে অপূর্ব লীলা দেখিয়ে গেলেন, শৈশবে গদাধরের ভাবভঙ্গীতে ও আচরণে তার আভাস স্বতঃই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল;—ভগবৎপ্রাপ্তি এবং ভগবদ্জ্ঞান লাভের পথে মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের যে কোনই মূল্য থাকে না তা ভগবান স্বয়ং এই সংসারে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের চোখে আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দিলেন একজন অতি গেঁয়ো নিরক্ষর ব্যক্তির দেহে প্রকট হ'য়ে।...তাই বাল্যে গদাধরের জীবনে দেখা গিয়েছিল বিদ্যার্জনের প্রতি তাঁর ওরকম অমনোযোগিতার ভাব,—পাঠশালায় গিয়ে গদাধরের প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠত, অঙ্ক-কষা এবং পড়া-মুখস্ত করা তাঁর কাছে একটা বিষম দায় ব'লে মনে হ'ত। ওরকম না হ'লে যে ভগবানের উদ্দেশ্য সফল হ'ত না, কারণ তিনি চেয়েছিলেন—নিরক্ষরের মধ্যে 'অক্ষরের' ক্ষরলীলা প্রকাশ করতে,—তৎকালীন সমাজের পাণ্ডিত্যাভিমানীদের পাণ্ডিত্যের গর্বকে ধূলিসাৎ করতে। কেশব সেনের ন্যায় বাগ্মী পুরুষও সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পূজারীর চরণতলে ব'সে জ্ঞান ভিক্ষা করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেননি। কিন্তু তবুও সেই সময় কোনো-কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি পরমহংসদেবের দিব্য ভাবোন্মাদনাকে লক্ষ্য ক'রে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। শিবনাথ শাস্ত্রীর ন্যায় একজন অকপট সত্যান্বেষী শিক্ষিত ব্যক্তিও ঠাকুরের ভাববিহ্বলতার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি তাঁর আত্মচরিতে ঠাকুরের ভাবোন্মাদনাকে লক্ষ্য ক'রে লিখেছেন—"...তাঁহার (ঠাকুরের) একটি পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি।"...ঠাকুরের এই মহাভাবের অবস্থাকে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থূল দৃষ্টি 'পীড়ার সঞ্চার' এবং সাধারণ মূর্চ্ছা হিসাবেই দেখেছিল। কিন্তু বৈষ্ণব পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঠাকুরের সেই ভাব ও অবস্থা অন্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল,—ঠাকুরের ভাবোন্মাদনাকে লক্ষ্য করে বৈষ্ণবচরণ মথুরবাবুকে বলেছিলেন—"এ উন্মাদ সামান্য নহে,—প্রেমোন্মাদ। ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল।"

এই মর্ত্য আধারে ভগবানের শক্তি যখন নেমে আসে মানুষের মন-প্রাণ-দেহের অবস্থা তখন আর তার আয়ত্তে থাকে না, কারণ তুরীয় বিভবকে সজ্ঞানে সক্ষম অবস্থায় ধারণ করবার জন্য এই মর-আধার এখনও উপযুক্ত বা তৈরী নয়, তাই ঐশীশক্তি বিকাশের ফলে মানুষের শরীরে নানাবিধ বৈকল্য দেখা দেয়। যুগোপযোগী সাধনার দ্বারা যেদিন এই মরদেহেরও রূপান্তর সাধন সম্ভব হবে সেই দিন এই পার্থিব দেহ তুরীয় ভাবসমূহকে ধারণ করতে সক্ষম হবে সম্পূর্ণ সচেতন জাগ্রত অবস্থায়,—যে অবস্থা এবং যে রূপান্তর শ্রীঅরবিন্দ স্বীয় জীবনে অধিগত ক'রে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে গেলেন তাঁর জীবনব্যাপী কঠোর এবং সর্বাঙ্গীণ সাধনার দ্বারা।

মানব-আধারে ঐশীশক্তির আবির্ভাবেব ফলে যেসব ভাবের বিকাশ হয়,

আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত, বুদ্ধিগরবী ব্যক্তিদের স্থূল দৃষ্টিতে এবং বোধে তার প্রকৃত মর্মটি ধরা পড়ে না, তাই সেইসব ভাবুকদের লক্ষ্য ক'রে অনেকে আবার নানাভাবে উপহাসও ক'রে থাকেন। এই সব বুদ্ধিগরবী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের অহং এবং অজ্ঞতার মূলে নিদারুণভাবে আঘাত করেছেন বর্তমান যুগে অতিমানস-দিশারী যুগাবতার শ্রীঅরবিন্দ। জগতের সর্ববিদ্যা অধীত ক'রে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে একজন অতি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় বাহুল্যবর্জিত জীবন-যাপনদ্বারা তিনি জগদ্বাসীকে দেখিয়ে গেলেন—অধ্যাত্মজ্ঞান অর্জনের পথে পাণ্ডিত্যের মূল্য কত অকিঞ্চিৎকর; তুরীয় সম্পদ লাভ ও তার ক্রিয়াবলীর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে গেলে মানুষের কীরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার অন্তরে কীরূপ সারল্য ও অখণ্ড বিশ্বাসের প্রয়োজন। আলিপুর জেলে অবস্থানকালে একজন নিরক্ষর গ্রাম্য গোয়ালার অন্তরের সারল্য এবং ভগবদ্‌-বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কারাকাহিনীতে লিখেছেন :

"আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এ ব্যক্তি ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্ম-সম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আর্যশিক্ষা-সুলভ ধৈর্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহংকার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ।" ..

শ্রীঅরবিন্দের নিজের অন্তর অনুরূপ সম্পদে অধিকগুণে পূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যা-ভিমানশূন্য ছিল ব'লেই তাঁর দৃষ্টিতে সেই নিরক্ষর গোয়ালার প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়েছিল। .. শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যাবহারিক জীবন-যাপনেই আড়ম্বরশূন্য ছিলেন তা নয়, তাঁর চেতনার কোনও স্তরে, এমন কি, তার আনাচে-কানাচে অবধি তাঁর বিদ্যা, পাণ্ডিত্য এবং তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং সদ্‌গুণাবলীর গৌরব তাঁকে এতটুকুও স্পর্শ করতে পারেনি। তাই তিনি উক্ত বৃদ্ধের গুণকীর্তন ক'রে এমন-কথাও লিখতে পেরেছেন—"আমা হতে সহস্র গুণে উচ্চ হৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্বদা লজ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ হইত...।" ['কারাকাহিনী']

মাতৃভূমিকে বিদেশীর কবল হ'তে শৃঙ্খলমুক্ত করবার মহান্‌ ব্রত নিয়ে বিলাত থেকে স্বদেশে ফিরে যখন তিনি বরোদা এস্টেটে কর্মনিযুক্ত ছিলেন তখন প্রত্যক্ষদর্শী দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের যে সুন্দর বর্ণনা

দিয়েছেন তা অনেকেরই নিকট সুবিদিত। বরোদায় গিয়ে শ্রীঅবিন্দকে দর্শন করবার পূর্বে দীনেন্দ্রকুমার মনে ভেবেছিলেন যে, তখনকার দিনে শ্রীঅরবিন্দ-হেন একজন উচ্চ শিক্ষিত বিলাত-ফেরত ব্যক্তির সামনে তিনি কী করে গিয়ে হাজির হবেন, কারণ শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয়ই একজন পুরোদস্তুর সায়েবের মতই থাকেন।...কিন্তু বরোদায় পৌঁছে যখন তিনি প্রথম শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করলেন তখন তাঁর মনে বিস্ময়ের অবধি রইলো না—শ্রীঅরবিন্দকে তিনি দেখলেন স্বদেশের আত্মমূর্তিরূপে,—তাঁর পরনে স্বদেশী মিলের মোটা ধুতি, গায়ে মোটা কাপড়ের তৈরী মের্জাই এবং পায়ে নাগরা জুতো। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে' নেওয়ার কল্পনা তখনও দেশবাসীর অন্তরে জাগেনি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সেই ১৮৯৩ সালে ইংলণ্ড প্রবাস থেকে ভারতে ফিরেই সে-আদর্শকে স্বীয় জীবনে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে মাতৃব্রতধারী আত্মভোলা শ্রীঅরবিন্দ কী রকম সাধারণভাবে জীবন-যাপন করতেন তার পরিচয় শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান সায়েবের উক্তিতে পাওয়া যায়—"আপনি নাকি বি-এ পাস করিয়াছেন ? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়া ছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে ?"...এর উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ ক্রেগান সাহেবকে শুধু এই কথা বলেছিলেন—: "আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।"...সায়েব অমনি সজোরে উত্তর করেছিলেন..."তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সব কাণ্ড ঘটাইয়াছেন ?"

সায়েবের ঐরূপ উক্তিতে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছেন—"দেশহিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্যব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝানো দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।" ['কারাকাহিনী']

পরবর্তী যুগে দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করতে বহু দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সেকালে শ্রীঅরবিন্দ-হেন একজন সর্বগুণ এবং সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন কৃতবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তির ঐরূপ ত্যাগ মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। আর তাঁর এই ত্যাগনিষ্ঠা অপর ব্যক্তিদের মতো দেশ-হিতৈষণা বা পরোপকার-ব্রতের প্রতি সাময়িক কোন একটা ঝোঁকের ফলে আসেনি, জন্ম হতেই তাঁর মধ্যে ঐ ত্যাগের বীজ উপ্ত হয়েছিল। তাই তাঁকে দেখা যায় বাল্যে বিলাত-প্রবাসে বিদ্যার্জনকালে সব অভাবকে উপেক্ষা ক'রে আত্মভোলা হ'য়ে জ্ঞানার্জনে মগ্ন থাকতে।...শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগ জগতের

তথাকথিত ত্যাগ ব্রতীদের বাহ্য ত্যাগের পর্যায়ে সীমিত ছিল না। দেশসেবা, মানবসেবা ইত্যাদির প্রেরণায় মানুষ তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পথে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু দেশসেবা এবং জনসেবা করার অহংকে মানুষ সহজে ত্যাগ করতে পারে না—সে 'একজন নেতা' বা 'একজন বড় কর্মী' কিংবা সরকারী গদিতে 'হোমরা-চোমরা একজন কেউ-কেটা' এই অহং তার চেতনার সঙ্গে সর্বদাই জড়িয়ে থাকে, দেশ যদি তার নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ না করে বা তার হুকুম মেনে না চলে তবে তার মনে অভিমান হয় এবং তার অহং-এ ঘা লাগে, সে অস্বস্তি বোধ করে,—বিশ্বলীলায় জগন্মাতার কর্মের লীলাসাথীরূপে তাঁর হাতের যন্ত্ররূপে নিজেকে উপলব্ধি করতে সে পারে না। সুতরাং প্রকৃত ত্যাগব্রতীর ব্রত উদ্‌যাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এই ত্যাগাদর্শ ভারতেরই বৈশিষ্ট্য এবং তা সাধনাসাপেক্ষ।

বর্তমান যুগে শ্রীঅরবিন্দ-জীবনেই প্রকৃত ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। সাধারণ কর্মক্ষেত্রে, সংসারক্ষেত্রে এবং দেশসেবার ক্ষেত্রে, এমনকি অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও কর্মের এতটুকু অহং তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি, ভগবানের ইচ্ছার প্রতি নিঃশেষে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন ; তাঁর সমগ্র জীবনের প্রতিটি কর্ম সংসাধিত হয়েছিল তাঁর অন্তর্যামীর অমোঘ প্রেরণায় ; এ-সত্য শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার কর্মক্ষেত্রেই, এবং তাঁর সেই উপলব্ধির কথা সেই সময় তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত এক পত্রে তিনি প্রকাশও করেছিলেন—"...কিন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল।"...

দুই

শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে এ-সত্য স্বীকার না ক'রে পারা যায় না যে, স্বয়ং ভগবান তাঁর যুগলীলা পূর্ণ করবার জন্য শ্রীঅরবিন্দরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে যুগ-প্রয়োজনে জগদ্বাসীকে দিয়ে গেলেন এক নূতন আলোকের স্থির সন্ধান 'মানুষীং তনুম্ আশ্রিতঃ' হ'য়ে। শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় এমনি একটি আধারেরই ভগবানের প্রয়োজন ছিল।—বর্তমান যুগের তমোমগ্ন, আত্মবিস্মৃত এবং পরধর্মবিলাসী ভারতবাসীকে সচেতন ক'রে তোলবার জন্য, বিশেষ ক'রে, ঘোর জড়বাদী প্রাণধর্মী পাশ্চাত্যবাসীকে তাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের উপযুক্ত ক'রে, তাদেরই ভাষায় এক মহা সমন্বয়মূলক অধ্যাত্মজ্ঞান পরিবেশন করবার জন্যই যেন এই মর্ত্যলোকে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব।

যেসময়ে শ্রীঅরবিন্দ এই পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেন, সেসময় অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীই স্বজাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার কথা ভুলে গিয়ে বিজাতীয় ভাবে মাতোয়ারা ছিলেন ; বিজাতীয় শিক্ষা, বিজাতীয় আদব-কায়দাই তাঁদের কাছে তখন পরম গৌরবের বস্তু ছিল। যদিও সেই সময়ে বাংলাদেশের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বহু মনীষী ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার বিষয়ে সজাগ হ'য়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু সেসব ব্যাপারেও তাঁরা পাশ্চাত্যের ভাব-ভঙ্গীকেই অনুসরণ ক'রে চলেছিলেন। এ-বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন্'-এ তাঁর মন্তব্য প্রকাশ ক'রে তখন বলেছিলেন—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় মুক্তি, সামাজিক শুদ্ধি, আধ্যাত্মিক নবজন্মের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাকে সকল বিষয়ে নিরাশ-হইতে হইয়াছে, কারণ দেশের নিজস্ব যে অন্তর-পুরুষের প্রতিভা, যে কর্মের ধারা, তাহা ভুলিয়া গিয়া সে পাশ্চাত্যের ভাব ও ভঙ্গী ধরিয়া চলিয়াছিল।"...

সুতরাং তৎকালে ভারতের সনাতন অধ্যাত্মশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপটি খুব কম ব্যক্তির দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল, তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষি রাজনারায়ণ বসু এবং কেশব সেন ইত্যাদির জীবনে তার বিকাশ হ'তে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত সমন্বয়-মূলক অধ্যাত্মজ্ঞান তখন সবার অগোচরে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছিল একজন নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পূজারীর অন্তরলোকে—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে—যাঁর দর্শন এবং স্পর্শলাভে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয়

অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি সমগ্র জগতের চিন্তাশীল মনীষীদের দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ তখনকার দিনে একজন বেশ পদমর্যাদাসম্পন্ন সিভিল সার্জন ছিলেন। গরীব-দুঃখীর প্রতি অপরিসীম দয়ায় এবং মমতায় তাঁর অন্তরটি ছিল পূর্ণ। এরূপ যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যা সহধর্মিণী ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর পরমা সুন্দরী দয়াবতী কন্যা দেবী স্বর্ণলতা। এরূপ একটি অভিজাত পরিবারে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম। সে তারিখটি ছিল ১৫ই আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৮৭২ সাল। (এইরূপ মাতা-পিতাকে অবলম্বন ক'রেই পরম করুণাময় পরাৎপর পরমেশ্বর এলেন নেমে।)

ডাঃ কৃষ্ণধন ছিলেন হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রামের বিখ্যাত ঘোষ-বংশের বংশধর। কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম কৃতী ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। কিন্তু অদৃষ্টের পরিণামে ভবিষ্য জীবনে কোন্নগরে বসবাস তাঁর ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। কারণ ডাঃ কৃষ্ণধন ছিলেন মনে-প্রাণে একজন উগ্র কুসংস্কার-বিরোধী, তাই তিনি তৎকালীন সমাজ-বিধিকে উপেক্ষা ক'রে ব্রাহ্মসমাজসেবী ঋষি রাজনারায়ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং ম্লেচ্ছদেশ-গমনের সামাজিক-বিধিনিষেধকে তাচ্ছিল্য ক'রে বিলাতে যান ডাক্তারী পড়তে। সিভিল-সার্জন হ'য়ে বিলাত থেকে তিনি যখন স্বদেশে ফিরে এলেন তখন কোন্নগরের হিন্দু-সমাজ তখনকার প্রচলিত সমাজবিধি মতে তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন। কিন্তু মনে-প্রাণে কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিপন্থী কৃষ্ণধন সমাজের সেই একান্ত গোঁড়া বিধানের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, পিতৃভূমির মায়া কাটিয়ে স্থানান্তরে চলে যান এবং তাঁর পিতৃপুরুষের বাস্তুভূমি এবং বসতবাটী অতি সামান্য মাত্র মূল্যের বিনিময়ে প্রায় দান ক'রে যান এক গরীব ব্রাহ্মণকে। তাঁর বাস্তুভিটার জন্য গ্রামস্থ অনেকেই তাঁকে অধিক মূল্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তুভিটা বিক্রী ক'রে অর্থ-লাভের প্রতি তাঁর মোটেই লক্ষ্য ছিল না, বাস্তুভিটা ঐ ব্রাহ্মণকে দেওয়ার বিষয়ে তিনি আগে থেকেই সংকল্প স্থির ক'রে রেখেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও কৃষ্টি ডাঃ কৃষ্ণধনের মনকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে বসলেও প্রকৃত দরদী ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণাবলী তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল; পোষাক-পরিচ্ছদে এবং আহারে-বিহারে তিনি সাহেবী-ঢংএ চললেও দরিদ্রেরা তাঁকে অতি আপনার জন বলেই জানতো। একজন উচ্চপদস্থ সিভিল সার্জনরূপে ডাঃ কৃষ্ণধনের মতো দরদীজন তখনকার দিনে অতি

বিরল ছিল। গরীব-দুঃখীর কাছে তিনি ভিজিট তো নিতেনই না, উপরন্তু নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে তাদের ঔষধপথ্য যোগাতেন। তাই তিনি যখন এক শহর হ'তে অন্য শহরে বদলি হ'য়ে যেতেন তখন সেখানকার লোকেরা ডাঃ কৃষ্ণধনের অভাবে নিজেদের অসহায় মনে ক'রে অশ্রু বিসর্জন করতো ; সত্যিই তিনি দরিদ্র জনসাধারণের নিকট বিপদভঞ্জন নারায়ণরূপে পূজিত ছিলেন। আর শ্রীঅরবিন্দের মাতাঠাকুরানী ছিলেন যোগ্য স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী। তাঁর পিতা ঋষি রাজনারায়ণের চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, মহদ্ গুণাবলী এবং ভারতকে আত্মসচেতন ক'রে তুলবার ক্ষেত্রে তাঁর মহান্ অবদানের কথা বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর অন্তরে চির জাগরূক থাকবে,—বঙ্গবাসীর অন্তরে আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভের চেতনা জাগিয়ে তুলতে সে সময় ঋষি রাজনারায়ণ বসুই সর্বপ্রথম প্রয়াসী হন,—এক কথায় তিনি হচ্ছেন স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্তনের পিতামহ, জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস-সৃষ্টির ভগীরথ।

দেবী স্বর্ণলতা ছিলেন এ-হেন পিতার সুযোগ্যা কন্যা—পিতৃ-সদ্গুণাবলী তাঁর চরিত্রে স্বতঃই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল এবং তাঁর রূপ-লাবণ্যও তাঁর স্বর্ণলতা নামটিকে সর্বাংশে সার্থক ক'রে তুলেছিল। তিনি এতই সুন্দরী ছিলেন যে, রংপুরে অবস্থানকালে সেখানকার সমাজের পরিচিতদের মধ্যে তিনি রংপুরের গোলাপ ব'লে অভিহিতা হ'তেন।—ডাঃ কৃষ্ণধন স্বীয় রুচি অনুযায়ী তাঁর পত্নীর জীবনকেও নিখুঁৎভাবে গ'ড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর তিনপুত্রকে তিনি চেয়েছিলেন উপযুক্তভাবে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে এক-একটি পুরো সায়েব তৈরী করতে। তাই তিনি গোড়া থেকেই তিন পুত্রের শিক্ষা শুরু করেছিলেন দার্জিলিংএ ক্রীশ্চান লরেটো কন্ভেণ্টে তাঁদের ভর্তি করে দিয়ে। সুতরাং প্রথম থেকেই শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা আরম্ভ হয় সম্পূর্ণ-রূপে ইংরাজী কায়দায়।

শ্রীঅরবিন্দ-আধারকে অবলম্বন ক'রে ভবিষ্যতে যে এক সুমহান্ সম্ভাবনা প্রকট হবে তা এক রাত্রে স্বপ্নদৃষ্ট এক ঘটনায় পাঁচ বৎসরের শিশু-অরবিন্দের অন্তরে, তাঁর অজ্ঞাতে, গভীরভাবে রেখায়িত হ'য়ে ওঠে—স্বপ্নে শিশু দেখে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এক ভীষণ মূর্তি, চোখ-দুটো তার আগুনের মতো জলজ্বল্ করছে এবং তার হাতে তীক্ষ্ণ শাণিত একটি ছুরিকা। সেই তীক্ষ্ণধার ছুরি-হস্তে ভীষণ আকার মূর্তিটি করাল দৃষ্টিতে ক্রমেই এগিয়ে আসছে শিশুর দিকে—কাছাকাছি হ'য়ে সে যেই শিশুর বুকে ছুরিকাটি বিদ্ধ করতে যাবে অমনি

তুমুল চীৎকারে সেই ঘুমন্ত শিশু অরবিন্দ জেগে ওঠে। গভীর রাত্রে শিশুর চীৎকার এতই তীব্র হয়েছিল যে তার ফলে কনভেন্টের লোকজন জেগে যায় এবং দ্রুত বালকের কক্ষে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তার চীৎকারের কী কারণ, কিসের ভয় তার? কিন্তু শিশু সম্পূর্ণ নির্বাক—শায়িত শিশুর দৃষ্টি উর্ধ্বে স্থির নিবদ্ধ। শিশুর সেই শান্তভাব লক্ষ্য ক'রে সবাই শিশুর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। কিন্তু সেই স্মরণীয় মুহূর্তে শিশু-অরবিন্দের মনে প্রশ্ন জাগে: কেন এই পৃথিবীর বুকে এরূপ অন্ধকারময় ক্রূর মূর্তি? এই কালো, এই অন্ধকার কি ধরিত্রী থেকে মুছে ফেলা যায় না? ··শিশুর অন্তরে জাগ্রত প্রভু তখন যেন হাসলেন, মৃদু-মধুর স্বরে তাকে জানিয়ে দিলেন: 'অক্ষয় আলোক-বর্তিকা' জেলে জগতের সব অন্ধকার দূর করবার জন্যই আমি তোমার মধ্যে নেমে এসেছি।" ··সেই মুহূর্তেই শিশু-অরবিন্দের অন্তরাত্মায় এই পার্থিব-চেতনার রূপান্তর-সাধনার বীজ হ'ল উপ্ত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকলো এবং ক্রমে বহু শাখা-পল্লবে সজ্জিত হয়ে বিরাট বিটপীরূপ ধারণ ক'রে, অজস্র ফুলে-ফলে শোভিত হ'য়ে বিশ্ববাসীর অন্তরকে অপূর্ব বিস্ময়ে দিল ভ'রে।

সত্যই যখন শ্রীঅরবিন্দ-আধারকে অবলম্বন ক'রে ভারতের অন্তরে অক্ষয় আলোক-বর্তিকা প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠলো, যার উজ্জ্বল দীপ্তি অনুসরণ ক'রে ভারতবাসী তার 'পরাধীনতার রাত্রি আঁধার' উত্তীর্ণ হ'য়ে স্বাধীনতা-উষার অরুণ-আলোকে অবগাহন করলো, তার ছটা সর্বপ্রথম ধরা প'ড়েছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উন্মুক্ত দৃষ্টিতে। তাই তিনি সেই স্বদেশীযুগেই 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' আবাহন গীতিতে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর সেই সত্য উপলব্ধির বিষয় প্রকাশ ক'রে গেয়েছিলেন—

> " তোমার প্রার্থনা আজি
> বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি'
> জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
> তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
> দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
> জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি' দেশের আঁধার
> ধ্রুব তারকার মত, জয় তব জয়।"

ভারতের অন্তরাত্মায় বিধাতা-প্রজ্বালিত সেই আলোক-বর্তিকা এই পৃথিবীর বুক থেকে ক্রমে সকল অন্ধকার ও অমঙ্গলকে দূরীভূত ক'রে যে সমগ্র বিশ্বে মঙ্গলের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে তা' সুনিশ্চিত। ...মহাত্মা গান্ধীর দেহাবসানের অব্যবহিত পরে দেশের নেতৃবৃন্দ যখন একবাক্যে দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন—"যে আলোক এসেছিল তা নিভে গেল।"...তখন কিন্তু একমাত্র শ্রীঅরবিন্দই দেশবাসীকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন—"যে আলো আমাদের স্বাধীনতার কাছে এনে পৌছে দিয়েছে—যদিও এখনো ঐক্যে পৌছে দেয়নি—সে আলো এখনও জ্বলছে আর তা জ্বলতে থাকবে যতদিন না তার পূর্ণ বিজয় হয়।"

"The Light which led us to freedom though not yet to unity, still burns and will burn on till it conquers"...

তিন

যে ভাব নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ জন্মেছিলেন এবং যে মহান্ ব্রত সাধনের জন্য এই পৃথিবীর বুকে তাঁর আবির্ভাব সে বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাল্যাবস্থাতেই এক গভীর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে সে-কথা স্বীয় পত্নীর নিকট এক গোপন পত্রে তিনি প্রকাশও করেছিলেন :

"এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠারো বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

(শ্রীঅরবিন্দের পত্র)

শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি হ'তে স্পষ্টই বোঝা যায়—আঠারো বৎসর বয়সে আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েও কেন তিনি অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে নিজেকে উক্ত বিষয়ে অযোগ্য প্রতিপন্ন করলেন। অশ্বচালন পরীক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের এই অনুপস্থিতি এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি আকস্মিকভাবে দেখা দেয়নি। কারণ তাঁর অন্তরে জাগ্রত প্রভু স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায় ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দকে এগিয়ে নিয়ে চলেলেন মহা সিদ্ধির পানে।

পিতা চেয়েছিলেন—পুত্র বিলাতে ভালভাবে লেখাপড়া শিখে, আই-সি-এস পাস ক'রে স্বদেশে ফিরে সরকারী-চাকুরীতে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরূপে তাঁর কুলের গৌরব বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু তাঁর সে-আশা সফল হ'ল না। কারণ শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তিগতভাবে শুধু তাঁর পিতার একটি ক্ষুদ্র আশাকেই সফল করতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন এই পৃথিবীর সমগ্র মানবকুলের যুগ-যুগ সঞ্চিত অতৃপ্ত আশাকে পূর্ণ করতে ; কেবলমাত্র বাংলাদেশের একটি কুলের গৌরবকেই বৃদ্ধি করতে নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির তথা প্রত্যেকটি ভারতবাসীর গৌরবকে বিশ্ব-দরবারে শতগুণে বর্দ্ধিত করতে এবং তাকে চির-উজ্জ্বল রাখতে।

পিতার ব্যবস্থা এবং নির্দেশ মতো দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত লণ্ডনে এক ইংরাজ-পরিবারের তত্ত্বাবধানে সাত বছর বয়স থেকেই শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা শুরু হয়। অসামান্য প্রতিভাবলে অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি পাশ্চাত্যের প্রাচীন ভাষাসমূহে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রীঅরবিন্দের সেই প্রতিভা এবং কৃতিত্ব লক্ষ্য ক'রে তথাকার শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন ; একবার এক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় তাঁর উত্তর-লিপির প্রশংসা ক'রে এক চায়ের আসরে কিংস কলেজের পরীক্ষক অস্কার ব্রাউনিং কিশোর অরবিন্দকে বলেছিলেন—"আমি তের বছর ধরে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা করছি, তার মধ্যে তোমার উত্তরপত্রের মতো এতো ভাল উত্তরপত্র আমার হাতে আসেনি, তোমার প্রবন্ধটি এত চমৎকার হয়েছিল !"...এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পিতৃদেবকে এক পত্রে যা লিখেছিলেন তার কিয়দংশ নিম্নরূপ—

"গত রাত্রে আমি জনৈক অধ্যাপকের ঘরে কফি পান করিবার আমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম. সেখানে সুবিখ্যাত ও-বি'র অর্থাৎ অস্কার ব্রাউনিং-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। ইনিই কিংস কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার। তিনি আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে নাচের কথা হইতে পাণ্ডিত্যের কথা পর্যন্ত আলোচনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, আমি অনুমান করি, তুমি জানো যে, তুমি অসামান্য এক উঁচু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমি এই রকম তেরটি পরীক্ষার উত্তর-পত্র পরীক্ষা করিয়াছি কিন্তু তোমার মত চমৎকার উত্তর-পত্র আর দেখি নাই (বৃত্তি-পরীক্ষায় প্রাচীন সাহিত্যের উত্তর-পত্রের কথা তিনি উল্লেখ করিতেছিলেন) আর তোমার প্রবন্ধ এটা আশ্চর্য।"

কিশোর বয়স হতেই শ্রীঅরবিন্দের এই অত্যদ্ভুত প্রতিভা লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দের অন্তরে কার অঘটনঘটন-পটিয়সী শক্তি সতত ক্রিয়াশীলা ছিল।

ইংলণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা পাশ্চাত্ত্য প্রথায় পাশ্চাত্ত্য পরিবেশের মাঝে সম্পর্ণ হ'ল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য আদব-কায়দা এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও কৃষ্টির ছোঁয়াচ তাঁর অন্তরে এতটুকুও লাগলো না, বিরুদ্ধ পরিবেশের মাঝেও তাঁর অন্তরে-বাহিরে ধীরে-ধীরে ফুটে উঠতে থাকলো ভারতের চিদানন্দঘন আত্মমূর্তি। যখন তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন দেশবাসী তাঁর সে-মূর্তি দেখে হ'ল বিস্মিত!—ইংলণ্ড-প্রবাসে বাল্যাবস্থাতেই শ্রীঅরবিন্দের অন্তরে ভাবীকালের জগতের পরিবর্তিত রূপের একটা সুস্পষ্ট আভাস পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল,—সে রূপ হ'চ্ছে জগতের সমগ্র মানব-সমাজের শৃঙ্খলমুক্তির এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপক আন্দোলনের রূপ আর জগদ্বাসীর প্রতি ভারতের সুমহান্ অবদানের উজ্জ্বল দৃশ্য এবং ভারতের সেই মহান্ ও শ্রেষ্ঠ অবদানকে সার্থক ক'রে তুলবার জন্য তাঁর নিজের করণীয় কী এবং স্থান কোথায় তা-ও তিনি সেই সময় টের পেয়েছিলেন, এবং তিনি একটি বিষয় স্থির ভাবে বুঝেছিলেন যে, ভারতের সেই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপন করতে হ'লে ভারতবাসীর পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভারত-জননীকে বিজাতির কবল থেকে চিরমুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রাথমিক পন্থা অবলম্বন মানসে তাঁরা কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় মিলে লণ্ডন শহরে একটি সিক্রেট পার্টি (গোপন সংঘ) গঠন করেছিলেন। এই গুপ্তদলের নাম করণ হয়েছিল "লোটাস এণ্ড ড্যাগার।") এই যে অদ্ভুত নামকরণ—'পদ্ম এবং অসি', এর গভীর তাৎপর্য আছে—'অসি' হচ্ছে শক্তির প্রতীক্, আর পদ্ম স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ—ভারতের অন্তরাত্মা,—শক্তি-সাধনায় সিদ্ধি-অর্জন-দ্বারা ভারত-মাতার শৃঙ্খল মোচনের পর ভারতের অন্তরাত্মারূপ মুদিত শতদল অপূর্ব শোভায় সমগ্র জগদ্ব্যাপী ধীরে ধীরে মেলে ধরবে তার প্রতিটি দল, আর সেই পূর্ণবিকশিত অরবিন্দ-মকরন্দ পানে বিশ্ববাসীর তৃষিত অন্তর হবে পরিতৃপ্ত, হবে ধন্য, ভারত-আত্মার আত্মবাণীতে সারা বিশ্বময় নবরূপে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে ভারতের ঋষি-পিতামহের সেই অমৃতময় বাণী: "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

শ্রীঅরবিন্দের আত্মবাণী যে একদিন পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে এবং জাতীয় জাগরণের ঋষি-কবিরূপে দেশবাসীর নিকট তিনি চির-পূজিত থাকবেন তা' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আন্তর-উপলব্ধিতে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল।

তাই তিনি আলিপুর সেসন্স কোর্টে শ্রীঅরবিন্দের বিচার-সমাপ্তি বক্তৃতায় ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে ওজস্বিনী ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—

... 'That long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and reechoed not only in India, but across seas and lands."

অর্থাৎ এই সমস্ত বিচার-বিতর্ক এবং দ্বন্দ্ব-কোলাহল একদিন শুব্ধ হইয়া যাইবে, আলোড়নেরও নিবৃত্তি ঘটিবে। তাহার বহু পরে সুদূর ভবিষ্যতে, এই ব্যক্তির নরদেহ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও ইনি দেশপ্রেমের এক মহাকবিরূপে, স্বাজাত্যবোধের এক শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক এবং মানব-প্রেমিকরূপে কীর্তিত হইবেন। ইহার তিরোধানের পর বহু দূরবর্তী ভবিষ্যতেও ইহার বাণী ধ্বনিত হইতে থাকিবে, শুধু ভারতেই নয়, দূর দেশ-দেশান্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি হইবে রণিত।"

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী প্রয়াণের বহু বৎসর পরে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ইওরোপ যাত্রার পথে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরী অবতরণ ক'রে যখন শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেন তখনও তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি প্রণতি নিবেদন ক'রে প্রকাশ করেছিলেন—

"...প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি তাঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরের আলো জ্বালবেন।...আপনার মধ্যে ঋষি-পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, "যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশন্তি।" আমি তাঁকে ব'লে এলুম, আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

ইংলণ্ড-প্রবাস থেকে শ্রীঅরবিন্দ যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বম্বেতে এ্যাপোলো বন্দরে অবতরণকালে ভারত-মৃত্তিকার প্রথম স্পর্শেই তাঁর অন্তরে প্রসুপ্ত ভারত-আত্মার জাগরণ শুরু হ'য়ে যায়;—শ্রীঅরবিন্দ তখন প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন—এক প্রগাঢ় প্রশান্তি তাঁর সমগ্র চেতনায় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে, যে প্রশান্তি কয়েক মাস যাবৎ তাঁকে ঘিরে ছিল এবং

পরবর্তীকালে যা ক্রমান্বয়ে তাঁর জীবনে স্থায়ী রূপ নিয়ে তাঁকে সকল অবস্থায় এবং সকল কর্মে নির্বিচল রেখে চলেছিল। চিত্তের এইরূপ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমতা লাভের ফলে ক্রমেই তাঁর মানসপটে অন্তর্জগতের সত্যসমূহ প্রতিফলিত হ'তে শুরু করেছিল; শত কর্মের মাঝেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো আমাদের এই মরদৃষ্টির গণ্ডীর বাহিরে বিরাজিত অজানা সব দৃশ্যাবলীর প্রতি; লোক-লোকান্তরের রহস্যাবলী প্রতিভাত হ'ত তাঁর চেতনায়।...শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময় উক্ত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জড়বাদী ইংরাজ এ, বি, ক্লার্কের স্থূল দৃষ্টিকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে কে যেন জানান দিয়ে যায় শ্রীঅরবিন্দের সেই উদাস দৃষ্টির আন্তর রহস্যের মর্মকথা। বরোদা কলেজের, শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তী, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পরলোকগত সি, আর, রেড্ডি মহাশয় ইং ১৯৪৮ সালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার শ্রীঅরবিন্দকে অর্পণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সেই উপলক্ষে এক ভাষণ দেন, তাতে তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন প্রসঙ্গে উক্ত এ, বি, ক্লার্কের শ্রীঅরবিন্দ-বিষয়ে উপলব্ধির কথা প্রকাশ ক'রে বলেন—

"বরোদা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ এ, বি, ক্লার্ক শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—'আপনি তবে অরবিন্দ ঘোষকে দেখিয়াছেন? তাঁহার চক্ষু-দুইটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি? উহাতে ঊর্ধ্বলোকের রহস্যময় অগ্নি এবং আলোক রহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি এই মর্ত্যলোকের গণ্ডী ভেদ করিয়া একেবারে পরোপারে গিয়া পৌঁছে।' মিঃ ক্লার্ক আরও বলিয়াছিলেন—'জোন অফ আর্ক যদি স্বর্গীয় বাণী শুনিয়া থাকেন, অরবিন্দের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় স্বর্গীয় দৃশ্যাবলী।'...মিঃ ক্লার্ক ছিলেন একজন জড়বাদী ব্যক্তি, সুতরাং আমি ইহা কখনই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, ঐরূপ একজন বস্তুতান্ত্রিক অথচ আনন্দপ্রিয় ব্যক্তিটির দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দ-চেতনায় অনুস্যূত সত্য কী করিয়া ধরা পড়িল?"

পরাৎপর পরমেশ্বর যখন তাঁর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবদেহ ধারণ করেন—মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্—বৈষ্ণব ভক্তগণ তাকে এই মর্ত্যধামে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ ব'লে থাকেন। ভক্তের এ-উক্তি তাঁদের শুধু ধারণামাত্রই নয়, এ তাঁদের জাগ্রত উপলব্ধিগত সত্য। গীতায় ভগবান স্বয়ং সে-কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

শ্রীঅরবিন্দ-আধারকে অবলম্বন ক'রে যে এক অলৌকিক শক্তির খেলা চলেছিল তার কিছু আভাসমাত্র কয়েকটি ভাগ্যবান ব্যক্তির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—শ্রীঅরবিন্দের স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রকট হবার বহু পূর্বেই। মিঃ এ, বি, ক্লার্ক তাঁদের মধ্যে একজন এবং পরবর্তীকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যে যুগ-প্রয়োজনে শ্রীঅরবিন্দ-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন সে-সত্য সর্ব-প্রথম শ্রীমায়ের ভাগবতী দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়—তিনি যখন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেন পণ্ডীচেরীতে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে একজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমা তাঁর এই নিগূঢ় উপলব্ধির বিষয় প্রকাশ করে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"শ্রীঅরবিন্দকে দেখবামাত্র আমি চিনতে পারলাম, ইনিই আমার ধ্যান-লোকে পরিচিত সেই বিশেষ ব্যক্তি যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডেকেছি।—এ-ই যথেষ্ট, এতেই তুমি বুঝতে পারবে, কোথা থেকে আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, এখানে এই ভারতে ওঁর পাশেই আমার স্থান, আর ওঁর সঙ্গে মিলিত হয়েই আমার যা-কিছু কাজ।"

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ তারিখে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দকে প্রথম দর্শন ক'রে তাঁর ৩০শে মার্চের প্রার্থনা-বাণীতে যে-কথা প্রকাশ করেন তাতে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে শ্রীমা-র সত্য-উপলব্ধি বিষয়ে আরও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়—

"ধীরে-ধীরে সুদূর দিগন্ত স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে, চলবার পথের রেখা এবার স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আমরা এগিয়ে চলেছি নিশ্চয় থেকে আরও বেশি নিশ্চয়তার দিকে।

শত শত প্রাণী এখনও যদি অতি গাঢ় অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, তাতেও এখন আর বিশেষ কিছু যায় আসে না। কাল আমরা যাঁকে দেখলাম তিনি তো এই পৃথিবীতেই বাস্তবরূপে অবস্থান করছেন, তাঁর এই উপস্থিতিটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয় যে, এমন একদিন আসছে যখন এই নিগূঢ় অন্ধকার উজ্জ্বল আলোকে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তোমার স্বর্গরাজ্য সত্য সত্যই একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।"…

জহুরী যে সে-ই জহর চেনে। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদেহকে অবলম্বন ক'রে প্রকৃতরূপে যে-সত্যটি এই পার্থিব চেতনায় প্রকটিত হবে তা' শ্রীমায়ের অভ্রান্ত দৃষ্টির কষ্টিপাথরে সুবর্ণ রেখার মতোই ফুটে উঠেছে।

পরবর্তীকালে, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পর, শ্রীঅরবিন্দের সত্যকারের মহিমা উপলব্ধি ক'রে যে-সব মনীষী শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন ক'রে যে-সব কথা বলেছিলেন, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তার কিছু পরিচয় এখানে দিচ্ছি। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বোক্ত মিঃ সি, আর, রেড্ডি মহাশয় তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার শ্রীঅরবিন্দকে অর্পণ উপলক্ষে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ হচ্ছে—

"ভক্তির পরিপূর্ণ বিনয়ের সহিত আমি শ্রীঅরবিন্দকে বর্তমান যুগের একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিভারূপে বরণ করিতেছি। তিনি জাতির একজন বীরপদবাচ্য অপেক্ষা আরও অধিক কিছু, মানবের ত্রাণকর্তাদিগের অন্যতম। যে ত্রাণকর্তাগণ সকল যুগের সকল জাতির সম্পদ, যাঁহারা অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান থাকিয়া আমাদের অস্তিত্বকে বিকশিত এবং রূপান্তরিত করিয়া চলেন, তাহা আমাদের জ্ঞানে ধরা পড়ুক আর না-ই পড়ুক।

"...শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া পণ্ডিচেরী প্রয়াণ করেন। কিন্তু কোনো ঋষি কি কখনো অবসর গ্রহণ করিতে পারেন? সাধারণ কর্মক্ষেত্র হইতে তিনি তাঁহার দেহকে অবসর দিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইঁহাদের এই বাহ্য অবসর ইঁহাদের অন্তরাত্মার স্বর্গশিখরে ঊর্ধ্বায়ণের এবং সমগ্র বিশ্বময় পরিব্যাপ্তিরই সূচনা করে। শ্রীঅরবিন্দের জড়দেহ পণ্ডীচেরীতে অবস্থান করিতেছে বটে, কিন্তু তাঁর আত্মপ্রভাব? সে-প্রভাবকে কি আমরা স্থান-কালের গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ করিতে পারি? তাঁহার আশ্রমটি জগতের অন্যতম জ্যোতিঃকেন্দ্র উহা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের ভক্তিমান এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিকে সমভাবে আকর্ষণ করে। সময়ের মানদণ্ডের বিচারে তাঁহার বয়স এখন ৭৬-৭৭ বৎসর, কিন্তু সময় কাল, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,—এই মাটির জগৎ এবং তাহার অশুদ্ধিও নহে। তাঁহার আত্মা ঐ অসীম আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ এবং তাহা অবস্থান করে এ-সবের বহু ঊর্ধ্বে।

"শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করেন যে, ক্রম-বিবর্তনের ধারায় আমরা এক উচ্চতর সত্তায় বিবর্তিত হইবে। এইরূপ বিবর্তনের ফলে আমরা আমাদের বর্তমান জীবনের সকল সংকীর্ণতা ও সকল দুঃখকষ্ট অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব, আমরা এমন এক জগতে বাস করিব যাহার ধারা হইবে ঐক্যপূর্ণ এবং অবিমিশ্র—তাহা হইবে মিলনের ও আনন্দের জীবন। ক্রমবিবর্তনের এই রীতি সম্পূর্ণ সত্য। ইহা এখন বর্তমান কালে ধীরে-ধীরে কাজ করিয়া চলিয়াছে এবং পূর্ণতা

সাধন না হওয়া পর্যন্ত তাহার কাজ থামিয়া যাইবে না। নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ সেই নবজীবন লাভ করিবে, যে-জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা বলিয়া কিছুই থাকিবে না এবং মৃত্যু আর পারিবে না তাহার করাল দংষ্ট্রা বিদ্ধ করিতে।

"সেই অভিনব আবির্ভাবের নিশ্চয়-বাণী প্রদান করিয়া শ্রীঅরবিন্দ আমাদিগকে শত হতাশা হইতে মুক্ত করিতেছেন। এই মৃত্যুর জগতে সেই অমর পুরুষ আমাদিগকে দান করিতেছেন অমরত্বের পরম নিশ্চয়তা।"...

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে রেড্ডি মহাশয়ের এই সত্য-উপলব্ধি তাঁর উন্মুক্ত দৃষ্টিরই পরিচায়ক।

বাংলা দেশের সংস্কৃতভাষার পণ্ডিত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দমূর্তি সেই পরাৎপর সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়েছিল, তাই একটি অপূর্ব সংস্কৃত স্তোত্র রচনা ক'রে শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণে তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করেছিলেন—তার প্রথম স্তবকটি নিম্নরূপ :—

শ্রীঅরবিন্দায়

জগজ্জালপালো নিরোধে নিধিস্ত্বং
ত্বমেবাসি বিশ্বস্য সারং নিধানম্।
পরঃ সচ্চিদানন্দসংঘাতমূর্তি-
স্ততস্ত্বং শরণ্যো মমৈবারবিন্দ॥

পরাৎপর পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দময় রূপটিকে স্বীয় জীবনে মূর্ত ক'রে তোলবার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সাধন-জীবনে বহু বাধা এবং সমস্যার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল। বীর যোদ্ধার অপরিসীম সাহস এবং অটুট মনোবল নিয়ে পথের পর্বতপ্রমাণ বাধাসমূহকে অতিক্রম ক'রে তিনি উপনীত হয়েছিলেন তাঁর উপলব্ধির সব বিভিন্ন স্তরে, এবং সেই সব স্তরের সত্যকে এখানে নামিয়ে এনে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অটলরূপে। যোগশৈলে আরোহণের পথে তাঁর সেই সব বাধার বিষয়ে তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লিখিত পত্রে কিছু আভাস দিয়েছিলেন—"আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল? সময় কি লাগেনি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন?—দিনের পর দিন মুহূর্তের পর মুহূর্ত। দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানিনা; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি—ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন—তাই যথেষ্ট।...(পণ্ডিচেরীর পত্র)

সেই সময় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনার কোন্ স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন এবং কোন্ স্তরে উঠলে তাঁর সাধনা পূর্ণ হবে, এবং ভারতের পক্ষে বর্তমান যুগে কিরূপ সাধনার প্রয়োজন, সে বিষয়েও তিনি উক্ত পত্রে লিখেছিলেন।… শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের তৎকালীন যোগসিদ্ধির অবস্থার বিষয়ে ঐ পত্রেই প্রকাশ করেছিলেন—"যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, লেলে যা দিয়েছিলেন—সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা; এদিক ওদিক ঘুরে দেখা, পুরাতন সকল খণ্ড-যোগের এটা ওটার ছোঁয়া, তোলা, হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এটার এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটার পিছনে যাওয়া।…তারপর পণ্ডিচেরীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ থিওরী (তত্ত্ব) যোগশরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তারই ডেভলপমেণ্ট (বিকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয়নি। আর দুই বৎসর লাগতে পারে।…"

শ্রীঅরবিন্দের এই 'পথ খোঁজা' এবং 'এদিক ওদিক ঘুরে দেখা'র বিষয়ে যতটা জানা যায় তা হচ্ছে—বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয়, লেলে তখন তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর (শ্রীঅরবিন্দের) নিজের অন্তঃপুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে এবং তাঁর অন্তঃপুরুষ তাঁকে যেভাবে চালিত করতে চান সেইভাবে তিনি চলতে পারেন কি না। এটা যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় তো লেলের কাছ থেকে বা অপর কারো কাছ থেকে তাঁর কোনো নির্দেশ নেবার দরকার করে না। কারণ লেলে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে বুঝতে রেরেছিলেন যে, অন্তর্যামী পরমেশ্বর শ্রীঅরবিন্দ-আধারে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রীঅরবিন্দকে তাঁরই নির্বাচিত পন্থায় স্বয়ং পরিচালিত করতে চান; সুতরাং সেখানে কোনো মানুষের আর কিছু করণীয় নাই,—শ্রীঅরবিন্দের শুধু কর্তব্য তাঁর অন্তরের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত জগদ্‌গুরুর নির্দেশ মতো তাঁর জীবনপথে অগ্রসর হওয়া। শ্রীঅরবিন্দ লেলের এই যুক্তিকে মেনে নিয়েছিলেন এবং সেইভাবেই তিনি তাঁর জীবনে সাধনা ও ব্রত পালন ক'রে চলেছিলেন। এই জন্য দেখ গিয়েছিল এক-একটি সজীব মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দ এমন কাজ ক'রে বসেছিলেন যা মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। লেলের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দের কতকগুলি অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ হয়, কিন্তু তখন তিনি যোগের বিষয়ে কিছুই জানতেন না, এবং যোগবস্তুটি কী তা-ও তাঁর জানা ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের সেই অনুভূতিগুলি হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে তিনি যখন বিলাত-

প্রবাস থেকে স্বদেশে ফিরে বম্বেতে এ্যাপোলো বন্দরে নেমে ভারত-মৃত্তিকা প্রথম স্পর্শ করেন তখন তাঁর মধ্যে যে বিপুল প্রশান্তি নেমে আসে এবং বহুদিন যাবৎ যা স্থায়ী থাকে। কাশ্মীরে তাখতি সুলেমান পাহাড়ের রিজের ওপর তিনি যখন ভ্রমণ করেন তখন সেখানে অনন্তের মহাশূন্যতা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন। নর্মদা-তীরে একটি মন্দিরে দেবী কালীর জাগ্রত অধিষ্ঠান তাঁর অনুভূত হয়, বরোদায় অবস্থানকালে প্রথম বৎসরেই এক শকট-দুর্ঘটনার সময় ঐশীশক্তির ক্ষিপ্র আবির্ভাব তাঁর মানসদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। এগুলি হচ্ছে তাঁর আভ্যন্তরীন অভিজ্ঞতা যা স্বতঃই ঘটেছিল অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে, এবং সেসব তাঁর সাধনার অঙ্গ হিসাবে নয়।

শ্রীঅরবিন্দ কোনো গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে-নিজেই যোগ আরম্ভ করেছিলেন তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে সেবিষয়ে কিছু পদ্ধতি জেনে নিয়ে; বন্ধুটি ছিলেন গঙ্গামঠের ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। শ্রীঅরবিন্দের এই যোগাভ্যাস প্রথমে অভিনিবেশসহকারে—একাদিক্রমে ছ'ঘণ্টা কিম্বা সারা দিন আরও বেশি প্রাণায়াম-অভ্যাসেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর যোগসাধনা এবং রাজনৈতিক কর্ম পরস্পরের মাঝে কোনো অসামঞ্জস্য এবং ইতস্ততঃ ভাব সৃষ্টি করতে পারেনি; যোগ আরম্ভ করেও উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে তিনি তাঁর পথে এগিয়ে চলেছিলেন। একজন গুরু অবশ্য তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই খোঁজার পথে একজন নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁকে গুরু বলে বরণ করেননি, যদিও একটা ব্যাপারে তাঁর যোগশক্তির বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল—যখন সেই সন্ন্যাসী বারীন্দ্রের প্রবল এবং অবিরাম জ্বরকে কেবলমাত্র পরিপূর্ণ এক গেলাস জল একটা ছুরী দিয়ে আড়াআড়িভাবে কেটে এবং মনে-মনে কী-একটা মন্ত্র আউড়িয়ে সারিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মনে খুব উঁচু ধারণা জন্মেছিল; কিন্তু লেলের সঙ্গে স্বল্পকালের জন্য সাক্ষাৎ হওয়ার আগে পর্যন্ত যোগপথে তাঁর কোনো গুরু বা সহায় ছিল না।…

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি অর্জন করেন। ঐ সালের ২৪ নভেম্বর হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধিদিবস। ঐ দিনে তিনি অধিমানসভূমির (ওভারমেন্টাল প্লেন) সত্যকে নামিয়ে এনে এই পার্থিব-

চেতনায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ এক পত্রে লিখেছিলেন—

"২৪শে নভেম্বরে (১৯২৬) ঘটেছিল পার্থিব চেতন-লোকে কৃষ্ণের অবতরণ এই কৃষ্ণ কিন্তু অতিমানস-সত্তার জ্যোতি নন। কৃষ্ণের অবতরণের অর্থ হচ্ছে অতিমানস ঐশী-সত্তারই অবতরণের এক মহা প্রস্তুতি আর এর থেকে সূচিত হবে অতিমানস ও আনন্দের আবির্ভাব কৃষ্ণ হচ্ছেন আনন্দময়, আনন্দের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েই তিনি অতিমানস-সত্তার বিবর্তনকে সহায়তা করেন।"—(২৯।১০।৩৪)

তবে দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্রে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পরাৎপর এবং উচ্চতম সত্য বলে স্বীকার করেছেন।

তারপর শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসলোকে উন্নীত হওয়ার এবং সেই লোকের সত্যকে, আলোককে, এই মাটির বুকে নামিয়ে আনার সাধনায় আরও পরিপূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন, সে-বিষয়ে তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক পত্রে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—"অতিমানস-সত্তার জ্যোতি এবং শক্তিকে স্থায়ীভাবে অধিকার করাই হ'ল এখন প্রধান উদ্দেশ্য।…"১৯২৬-এর পর দীর্ঘকাল আরও গভীর তপস্যায় অতিমানস জ্যোতিকে এই পৃথিবীর বুকে নামিয়ে আনার সাধনায় তিনি কী ভাবে কৃতকার্য হয়েছিলেন তা আমরা পরে আলোচনা করবার চেষ্টা করবো তবে পরবর্তীকালে যেসব মনীষী এবং ভক্তবৃন্দ শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন ক'রে তাঁদের অন্তরের যে উপলব্ধির বিষয় প্রকাশ করেন তাতেই শ্রীঅরবিন্দের যোগ সিদ্ধির এবং রূপান্তর-সিদ্ধির বিষয়ে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-রচিত পূর্বোক্ত সংস্কৃত-শ্লোকটি তার অপূর্ব আভাস।…শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের কিছুদিন পূর্বে মাননীয় কে, এম, মুন্সী মহাশয় শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন ক'রে যে-কথা প্রকাশ করেছিলেন তাতেও শ্রীঅরবিন্দের রূপান্তর সিদ্ধির বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন ক'রে দিল্লীতে ফিরে এক সভায় মুন্সীমহাশয় তাঁর ভাষণে বলেন—

"সেদিন শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার দুর্লভ সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। আমি তাঁকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বম্বেতে শেষবার দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন (পণ্ডিচেরীতে) আমি তাঁহাকে অন্য-এক রূপে দেখিলাম: উদ্দীপনাময় প্রশান্ত পরিবেশের মাঝে আমাদের কল্পনাগ্রাহ্য সুন্দরতম পরিণত সে রূপটি। তিনি একটি গদি-আঁটা চেয়ারের উপর স্মিত

মহিমায় সমাসীন ছিলেন। তাঁহার সুচিক্কণ শুভ্র শ্মশ্রু এবং সুবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশরাশি-শোভিত জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল ; সেই অপরূপ মূর্তি কী-এক অজ্ঞাত ভক্তির ভারে আমাকে নত করিয়া দিল। তাঁহার আঁখি দু'টি হইতে জ্ঞানের গভীর আলো বিকীর্ণ হইতেছিল। আত্মার বিশাল প্রশান্তিতে তাঁহার সমগ্র ব্যক্তিত্বটি এক জ্যোতির্ময় সত্তায় রূপান্তরিত বলিয়া প্রতীয়মান হইল, উহা বজ্রপাণি কোনো দেবতার দীপ্তি নয়, উহা ছিল অন্তরের জ্ঞানালোকের প্রদীপ্ত কিরণ।

"স্বল্প দূরত্বের ব্যবধানে থেকে আমি যাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলাম, তিনি আর আমার পূর্ব্বেকার সেই অধ্যাপক ছিলেন না এবং তিনি পূর্ব্বেকার সেই মনীষীও নহেন যাঁহার শিক্ষা হইতে আমি আমার জীবনের বিভিন্ন সময়ে কতিপয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, তিনি ছিলেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক জ্যোতির্ময় সত্তা।"

শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এই অধ্যাত্মসিদ্ধির সাধনা তাঁর অগোচরে সেই মুহূর্তেই শুরু হ'য়ে গিয়েছিল, যে মুহূর্তে তিনি ইংলণ্ড-প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে ভারতের পুণ্য মৃত্তিকা প্রথম স্পর্শ করেছিলেন। ভারত-মাতা যেন, যুগ-যুগ ধ'রে ঐ শুভ মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষানিরতা ছিলেন ;—ভারতের আত্মমূর্তিকে, তাঁর হৃদিপদ্মকে, স্বীয় বক্ষে ধারণ ক'রে ভারত-জননী সেদিন হয়েছিলেন চির-ধন্যা !…তারপর কীভাবে ভারত-জননী তথা জগৎ-জননীর ইচ্ছা শ্রীঅরবিন্দ-জীবনে রূপায়িত হ'য়ে চলেছিল সেই বিষয়ে এইবার আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

চার

শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলেত থেকে স্বদেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর বয়স পুরো বাইশ বছরও হয়নি, তিনি তখন একুশ বছরের একটি যুবক মাত্র। কিন্তু ঐ একুশ বছরের যুবকের মধ্যে সঞ্চিত ছিল ইউরোপের এবং ভারতের অতীত ও বর্তমান সমাজ-নীতি রাষ্ট্র-নীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ের গভীর জ্ঞান। তিনি ঐ বয়সের মধ্যেই পাশ্চাত্যের চারটি ভাষায় (গ্রীক, লাতিন, ইংরাজী ও ফরাসী) অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তা'ছাড়া জার্মাণী, ইতালীয় এবং স্প্যানীশ ভাষাতেও তিনি প্রয়োজনীয় জ্ঞান সঞ্চয় করেন, কিন্তু

ইংরাজী ভাষাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাতৃভাষার স্থান অধিকার ক'রে বসে। বিভিন্ন ভঙ্গীতে ইংরাজী ভাষায় রচনার কাজে তিনি অপূর্ব্ব পারদর্শিতা অর্জন করেন।—তাঁর রচিত "দি ফ্যানটম্ আওয়ার" ছোট গল্প, "লাইফ ডিভাইন" ইত্যাদি দর্শনগ্রন্থ "লেটারস্" এবং "সাবিত্রী"-মহাকাব্য তার প্রমাণ।

মাতৃভূমিকে রাজনীতি-শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য বিলাত-প্রবাসে দীর্ঘকাল ধরে একান্ত অভিনিবেশসহকারে বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানে শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন,—বিদেশী শাসকের সঙ্গে রাজনৈতিক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পূর্বে তিনি উপযুক্তভাবে অস্ত্রসজ্জিত হ'য়ে স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন। স্বদেশকে বিদেশীকবলমুক্ত করতে হ'লে ভারত-সন্তানের পক্ষে কীরূপ মনোবল এবং কীরকম প্রস্তুতির প্রয়োজন তার এক সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং কৌশল শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঐ বয়সের মধ্যেই আয়ত্ত করেছিলেন। তাই তিনি বিলাত থেকে ভারতে ফিরে আসার অনতিকাল পরেই ভারতবাসীকে আত্মসচেতন ক'রে তুলবার জন্য লেখনী ধারণ করেন। তখন নব প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের মডারেট নেতাদের তোষামোদমূলক এবং ভীরুতাপূর্ণ কর্মনীতির সমালোচনা ক'রে তিনি বম্বের ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন তা আজ অনেকেরই নিকট সুবিদিত। জাতির প্রকৃত সমস্যা কী এবং দুর্ব্বলতা কোথায় সে বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ "New Lamps for the old" প্রবন্ধে অতি চমৎকার এবং বীরত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন; তার কিয়দংশের মর্মার্থ নিম্নরূপ—

> "আমাদের নিজেদের বাইরের কোনো শক্তি আমাদের প্রকৃত শত্রু নয়,—আমাদের ভীরুতা, স্পষ্ট কথা বলার বিষয়ে আমাদের দুর্ব্বলতা এবং ক্ষীণদৃষ্টিপূর্ণ ভাবালুতাই আমাদের আসল শত্রু। আর আমাদের আবেদন, একটি উন্নতচেতা এবং আত্মসম্মানবিশিষ্ট জাতির আবেদন এ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের মতের উপর, এমন-কি ব্রিটিশের বিচার-জ্ঞানের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, আমরা কথা বলবো আমাদের সত্যকারের মানবতাবোধ নিয়ে, আমাদের দেশের মূক ও নির্যাতিত জনগণের প্রতি ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে।"

এ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের, এমনকি, ব্রিটিশকে অবধি কটাক্ষ ক'রে তীব্র ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ হওয়ায় তখন অনেকেরই মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং মডারেট নেতা মহাদেব রাণাড়ে এবং কংগ্রেসের অন্যান্য প্রবীণ নেতাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, এমন কি, মহাদেব রাণাড়ে ইন্দুপ্রকাশের সম্পাদককে এই ব'লে শাসিয়ে দেন যে, তিনি যদি আর শ্রীঅরবিন্দের ঐ ধরণের লেখা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেন তবে তাঁকে পুলিস দিয়ে গ্রেপ্তার করা হবে। সুতরাং ইন্দুপ্রকাশের সম্পাদক দেশপাণ্ডে তখন শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করেন—তিনি যেন তাঁর লেখনী কিছু নরম সুরে চালান। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রচনার স্বাধীনতাকে খর্ব করে কোনো-কিছু লিখতে রাজী হননি।

মডারেট নেতৃবৃন্দ যে সত্য-সত্যই ভ্রান্ত পথে চলেছিলেন, এবং দেশের মঙ্গল ও মর্যাদারক্ষা প্রকৃতই কোন্ পথে সম্ভব সে-বিষয়ে যে তাঁরা অন্ধ ছিলেন তা শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানে সহজেই ধরা পড়েছিল। তাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রবন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—"যদি এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথে চালনা করে তবে দুজনাই কি খানায় গিয়ে পড়বে না?"

শ্রীঅরবিন্দ তখন একুশ-বাইশ বছরের যুবক হ'লেও বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তিদের উদ্দেশে ওরূপ কথা বলার যোগ্যতা এবং সাহস তাঁর ছিল। কারণ তখন হ'তেই ঐ যুবকের হৃদয়-অরবিন্দে অধিষ্ঠিতা শতদলবিহারিণী বাগদেবী স্বয়ং তাঁর লেখনীকে আশ্রয় ক'রে তমোগ্রস্ত নিদ্রিত ভারত-সন্তানকে জাগিয়ে তোলবার জন্য চেতনবাণী শোনাতে শুরু করেছিলেন, সে-বাণী ভারতের আত্মবাণী।...পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ যখন প্রকাশ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তখন সে-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি সেই ১৯০৭ সালে শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর "নমস্কার" কবিতায় লিখেছিলেন—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।...............
"..........ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে-তারে দিয়াছেন বিপুল ঝঙ্কার—
নাহি তাহে ক্ষুদ্র তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস।..........."

শ্রীঅরবিন্দ-আধারে জাগ্রত শক্তি সম্বন্ধে দ্রষ্টা কবির উপলব্ধিগত উক্ত সত্য প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও প্রগতি-বিরোধী মডারেট নেতাদের তখনও চেতনা হয়নি। ভারত-জননীর শৃঙ্খলমুক্তির ব্রত সাধনে যেরূপ বীরোচিত সাহস নিয়ে ব্রিটিশের স্বেচ্ছাচারী নীতির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, মডারেট নেতারা তার বিরোধিতাই ক'রে চলেছিলেন। তা সত্ত্বেও হুগলিতে জাতীয় সভার অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দের কর্মতালিকাই অধিক ভোটে গৃহীত হয়েছিল। তাতে মডারেট নেতাগণ তখন দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন—"দেশবাসী তাদের প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা না শুনে একটি অনভিজ্ঞ যুবকের প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করলো।"...শ্রীঅরবিন্দ-আধারে সক্রিয় সত্যের বিষয়ে এমনি তাঁরা অন্ধ ছিলেন। কিন্তু দেশের শক্তিকে সংহত ক'রে তুলবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ তখন তাঁদের অসন্তুষ্ট না ক'রে তাঁদের সঙ্গে একটা আপস রফা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'লে তমোগ্রস্ত জাতিকে যে-কোনো উপায়ে সংঘবদ্ধ ক'রে তুলতে হবে, আর সে জন্য সকল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে অসীম ধৈর্যের সহিত।

দেশবাসীকে, বিশেষ ক'রে তৎকালীন বাংলার যুবকবৃন্দকে মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলবার বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই তিনি তখন ভারতক্ষেত্রে 'আনন্দমঠে'র আদর্শে ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চিন্তা ক'রে দেখেছিলেন, এবং সে-বিষয়ে 'ভবানীমন্দির' নামে তাঁর একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভবানী-মন্দির' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি অধিকতররূপে ছিল বারীন্দ্রকুমারের।...সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মাতৃব্রতী যুবকেরা তখন শ্রীঅরবিন্দের সামনে অসি এবং গীতা স্পর্শ ক'রে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতো। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত সেইসব যুবকের ব্রত ছিল অতি কঠোর,—পূর্ণ আনুগত্যের সহিত নীরবে তাদের গুরুর আদেশ পালন ক'রে চলতে হ'ত,—এক হাতে মৃত্যু এবং এক হাতে ব্রত উদ্‌যাপনের সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের এগিয়ে চলতে হ'ত বিপদসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ পথে। বাংলার যুবকদের তখন শ্রীঅরবিন্দ কীরূপ আদর্শে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীঅরবিন্দ-রচিত 'দুর্গাস্তোত্রে' তার পরিপূর্ণ রূপটির পরিচয় আমরা পাই। এই দুর্গাস্তোত্র বঙ্গভূমে তথা ভারত-মৃত্তিকায় মহাশক্তির জাগরণের জীবন্ত আবাহনমন্ত্র;—এই চিরন্তন শাশ্বত মন্ত্র জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি ভারত-

সন্তানের নিত্য অনুস্মরণীয় এবং পাঠ্য হওয়া উচিত। সেই দুর্গাস্তোত্রের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—

"মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি সর্ব্বশক্তিদায়িনি মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি,—শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও ॥

*   *   *

"মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণি ভীমে, সৌম্য রৌদ্ররূপিণি! জীবন-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান।

"মাতঃ দুর্গে! জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি, মাতঃ, গগন প্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমিরবিনাশী আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর।

*   *   *

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ-প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসংকল্প কর। আর অল্পাশী নিশ্চেষ্ট অলস ভয়ভীত যেন না হই।

*   *   *

মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব, অশুভ-বিনাশী তরবারি তব, অজ্ঞানবিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভহন্ত্রী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জ্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও ॥

শ্রীঅরবিন্দের এই দুর্গাস্তোত্র পাঠে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা আদি মাতৃবিগ্রহ পূজা শুধু গতানুগতিক নিয়ম পালনের জন্য এবং উৎসব-অনুষ্ঠান ক'রে হৈ-হল্লা করবার জন্যই নয়,—বাঙ্গালীর জীবনকে শক্তিময়, আনন্দময়, প্রেমময়, ঐক্যময়, ঐশ্বর্য্যময় এবং পবিত্র ক'রে গ'ড়ে তুলবার জন্যই বাঙালীর দুর্গাপূজা এবং মাতৃপূজা—মহাশক্তির শুভ-উদ্বোধন।

কিন্তু বাঙালী আজ তার শক্তি-আরাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃতপ্রায়, আনুষ্ঠানিক হৈ-চৈ এবং দলাদলি নিয়েই তারা মত্ত। তাই বাঙালী আজ এত শক্তিহীন, এত ভ্রান্ত। সিংহের জাতি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আজ যেন ক্রমেই এগিয়ে চলেছে শৃগালের পর্যায়ভুক্ত হ'তে। বাঙালীকে তার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হ'লে আবার তাকে একান্তভাবে শক্তি-সাধনায় ব্রতী হ'তে হবে। শক্তিপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ধরিয়ে দেবার জন্য শ্রীঅরবিন্দের এই দুর্গাস্তোত্র আবার নূতন করে ব্যাপকভাবে বাঙালী-সমাজে প্রচার করতে হবে।

পাঁচ

বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়াবার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় সুদীর্ঘকাল একান্ত নিষ্ঠার সহিত জ্ঞান আহরণ ক'রে নিজেকে আরও অধিকতররূপে যোগ্য ক'রে তুলেছিলেন—জাতিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য। সে সময় শ্রীঅরবিন্দ কিরূপ নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জনে নিযুক্ত থাকতেন, প্রত্যক্ষদর্শী দীনেন্দ্র-কুমার রায়ের বিবৃতিতে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—

"...অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত দুঃসহ মশকদংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 'জুয়েল ল্যাম্পে'র আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া উপবিষ্ট দেখিতাম। যোগনিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্য জ্ঞানশূন্য! ঘরে আগুন লাগিলেও বোধহয় তাঁহার হুঁস হইত না! তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রিজাগরণ করিয়া ইওরোপের নানা ভাষায় কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইওরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্ম্মাণ, রাশিয়ান, ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না। চসার হইতে সুইনবার্ণ পর্য্যন্ত সকল ইংরাজ কবির কাব্যগ্রন্থ তাঁহার পাঠাগারে সঞ্চিত ছিল। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস আলমারিতে, গৃহ-কোণে, স্টীলট্রাঙ্কে পুঞ্জীভূত ছিল। হোমারের ইলিয়াড দান্তের মহাকাব্য,

আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল।"

শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় দীর্ঘ ত্রয়োদশবর্ষকাল অবস্থান করেন এবং উক্ত প্রকারে অধিকাংশ সময় একান্ত অভিনিবেশ সহকারে আরও গভীর জ্ঞান সঞ্চয়ে নিযুক্ত থাকেন। ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়নে শ্রীঅরবিন্দ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন যে, ভারতের জ্ঞান এবং তার স্বকীয় মহত্ত্ব জগতের যে-কোন জাতি এবং দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি তাঁর 'দুর্গা-স্তোত্রে, এ-কথা অকুণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন—"জগৎশ্রেষ্ঠ ভারত জাতি।"...ভারতের এই জ্ঞান, এই মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এক উদার এবং বিশ্বজনীন ধর্মের উপর ছিল প্রতিষ্ঠিত, শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায়—"জগতের আর কোনো ধর্মে এত গভীর উপলব্ধি, অধ্যাত্ম-রাজ্যের এত রকমারি ও এমন স্পষ্ট জ্ঞান কেহ দেখাইতে পারে নাই।..." সুতরাং জগতে নবযুগ প্রতিষ্ঠায় ভারতই জগদ্বাসীকে দিতে পারে এক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী বিধান এবং প্রকৃত পথের সন্ধান। তাই শ্রীঅরবিন্দ ভারতবাসীকে পরানুকরণবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে তার ঋষি পিতামহের উদার জ্ঞান ও শিক্ষাকে, তার স্বধর্মকে, যুগোপযোগী ক'রে সমাজ-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য মনোযোগী হ'তে নির্দেশ প্রদান করেন। 'আইডিয়াল অফ কর্মযোগিন' প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তখন উক্ত বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, শ্রীযুত নলিনীকান্ত গুপ্ত তার যে অনুবাদ প্রকাশ ক'রেছেন, নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রে দিলাম—

"আমরা যে-কাজের ভার লইব তাহা একান্ত বাহিরের নয়, তাহা অন্তরের, তাহা আধ্যাত্মিক। আমাদের লক্ষ্য শাসনযন্ত্রের কেবল রূপ পরিবর্ত্তন করা নয়, কিন্তু একটা নেশনকে গড়িয়া তোলা। এই কাজের একটা অঙ্গ রাজনীতি, সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা অঙ্গ মাত্র। আমরা শুধু রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিব না, কিম্বা সমাজ-সমস্যা, সাধন-শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে কোনোটিকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া লইব না। কিন্তু এই সবগুলির ধারাকে একটি বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরিব—তাহার নাম 'ধর্ম্ম', আমাদের দেশের ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম হইতেছে বিশ্বের ধর্ম্ম। জীবন-নীতির আছে যে একটা মহান ধারা, মানবজাতির ক্রমোন্নতির আছে যে একটা গভীর তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ও উপলব্ধির আছে যে বিচিত্র রহস্য—ভারত তাহার রক্ষক, তাহার বিগ্রহ, তাহার প্রচারক। এই জিনিষটিকেই বলা হইয়াছে "সনাতন ধর্ম্ম"। বিদেশের পরধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে ভারতবর্ষ

তাহার সনাতন ধর্ম্মের জাগ্রত প্রাণটি হারাইয়া প্রায় শুধু কাঠামটি লইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু ভারতের এই ধর্ম্মকে যদি জীবনে মূর্ত্ত করিয়া না চলা যায়, তবে তাহার কোনই অর্থ থাকে না। শুধু আবার জীবনে নয়, জীবনে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সাহিত্য, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও প্রেরণা সকলের মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রতিভা প্রবেশ করিয়া সকলকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবে।”......

ভারতের সেই সনাতন অধ্যাত্ম আদর্শকে যুগোপযোগী ক'রে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল ক'রে ধ'রেছিলেন, এবং রাষ্ট্রমুক্তির সাধনায় জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে, সর্বাবস্থায় মনের অটল প্রশান্তি বজায় রেখে, সকল বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা ক'রে নির্ভীকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন চরম বিজয়ের পথে। ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে মডারেট পার্টি ও ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় কংগ্রেসের নূতন বিধান (কন্‌সটিটিউশান) গঠনের ব্যাপার নিয়ে, তাতে একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের দূরদর্শিতা এবং নির্ভীকতাই ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ বিজয়ের পথকে সুগম ও সুনিশ্চিত ক'রে দেয়। প্রথমে এরূপ স্থির হ'য়েছিল যে, কংগ্রেসের সেই অধিবেশন নাগপুরেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু নাগপুর মারঠাদের দেশ এবং প্রচণ্ডরূপে বামপন্থী। গুজরাটে কিন্তু সে সময় মডারেটদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল এবং সুরাটে তখন তাঁদের আধিপত্য ছিল যথেষ্ট। কাজেই মডারেট নেতারা নিজেদের সুবিধার জন্য সুরাটেই কংগ্রেসের অধিবেশন স্থির করেন। তাহলেও সব জায়গা থেকেই দলবল নিয়ে ন্যাশন্যালিষ্টরা সেখানে গিয়ে হাজির হন এবং শ্রীঅরবিন্দকে সভাপতি ক'রে তাঁরা সেখানে সাধারণের একটি সভা করেন। কোন্ পক্ষ ভোটের সংখ্যাধিক্য (মেজরিটি) লাভ করবে, সে বিষয়ে সকলের মনে কিছুক্ষণের জন্য সন্দেহ লেগে থাকে। অবশেষে দেখা যায় এ-হেন মডারেট সহরেও তথাকথিত ডেলিগেটদের জনতা থেকে ১,৩০০ জন মডারেটদের পক্ষে পাওয়া যায়, সেইভাবে, অপর পক্ষ, ন্যাশন্যালিষ্ট-দলে পাওয়া গিয়েছিল ১,১০০ জন; মাত্র দু'শো ডেলিগেট বেশি হওয়ায় মডারেট-দল সংখ্যাধিক্য লাভ করেন। পূর্বেই এটা টের পাওয়া গিয়েছিল যে, মডারেট নেতারা কংগ্রেসের জন্য এমন এক নূতন বিধান (কনসটিটিউশান) তৈরী ক'রে এনেছিলেন যে, সুরাট কংগ্রেসে সেটা পাস করাতে পারলে আগামী বহু বৎসরের জন্য চরমপন্থীরা আর কংগ্রেসের কোনো বাৎসরিক

অধিবেশনেই মেজরিটি লাভ করতে পারবে না। নবীন ন্যাশন্যালিষ্টরা, বিশেষ ক'রে মারাঠা যুবকেরা মডারেট নেতাদের এই দুরভিসন্ধিকে পণ্ড ক'রে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছিলেন এবং তাঁরা এ-ও স্থির ক'রেছিলেন যে, মডারেটদের যদি তাঁরা ভোটে হারাতে না পারেন তবে, যেমন ক'রে হোক, কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙে দেবেন।

চরমপন্থী যুবকদের এই মতলবের বিষয় তিলকের এবং অন্যান্য প্রবীণ নেতাদের জানা ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু তা জানতেন, কারণ এর মূলে ছিলেন তিনিই। অধিবেশন আরম্ভ হ'লে সভাপতি-নির্বাচন বিষয়ে কথা উত্থাপনের জন্য তিলক যখন সভামঞ্চের উপরে গিয়ে উঠলেন তখন মডারেটদল-কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি তাঁকে কথা বলার অনুমতি দিতে চাইলেন না, কিন্তু তিলক স্বীয় অধিকারের বিষয়ে দাবী জানিয়ে তাঁর বক্তব্য পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তখন সেখানে খুব সোরগোল শুরু হ'য়ে গেল; গুজরাটী স্বেচ্ছাসেবকরা তিলককে প্রহার করবার জন্যে তাঁর মাথার উপরে চেয়ার তুলে ধরলো। এই ব্যাপারে মারাঠীরা গেল ভীষণ ক্ষেপে—একটা মারাঠা-পাদুকা সভা-মঞ্চের উপরে শোঁ ক'রে ছুটে এল সভাপতি রাসবিহারী ঘোষের মাথাকে লক্ষ্য ক'রে এবং সেটা পড়লো গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর ঘাড়ের উপর। তারপর মারাঠা যুবকেরা দলবদ্ধ হ'য়ে যখন সভামঞ্চ আক্রমণ ক'রলো তখন মডারেট নেতারা যে যেদিকে পারলেন দৌড় দিলেন; অল্প কিছুক্ষণ চেয়ার-যুদ্ধের পর সভা গেল ভেঙে, এবং ভেঙে গেল তো গেলই, পরে আর বসলো না। এই রকম হৈ-হল্লা এবং মারপিটের সময়ে শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ চিত্তে প্রশান্তভাবে স্বীয় আসনে সমাসীন! প্রত্যক্ষদর্শী বারীন্দ্রের ভাষায়—"আমি তখন নীরব শান্ত অরবিন্দের পিছনে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছি। তেমন মানুষ-দৌড় আর জীবনে কখনো দেখি নাই, বোধ হয় আর কখনো দেখিবও না। সুরেন্দ্র ছুটিতেছেন, গোখেল ছুটিতেছেন, মেটা, ভূপেন্দ্র যে যার চৌকি ছাড়িয়া এ-দুয়ার ও-দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছেন।……" শ্রীঅরবিন্দ তেমনি প্রশান্ত চিত্তে ধীর পদে মণ্ডপের বাইরে বেরিয়ে যান। মডারেট নেতারা তখন কংগ্রেস অধিবেশন বাতিল ক'রে দিয়ে তাঁদের দলের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের মনোমত কন্‌স্টিটিউশান গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় অধিবেশন আরম্ভ করার বিষয় স্থির করলেন।

ইতিমধ্যে লালা লাজপৎ রায় তিলকের কাছে হাজির হয়ে তাঁকে

খবর জানালেন যে, গভর্ণমেণ্ট এই স্থির করেছেন, যদি কংগ্রেস ভেঙে যায় তবে চরমপন্থীদের উপর তাঁরা ভীষণ দমননীতি চালাবেন। তিলক তখন মনে করলেন—ঘটনার দ্বারা যা প্রমাণও হ'য়ে গেল—তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন যে, দেশবাসী কৃতকার্যতার সহিত এরকম অত্যাচারের সম্মুখীন হ'তে এখনও প্রস্তুত নয়, কাজেই তিনি মডারেটদের এবং গভর্ণমেণ্টের যুক্তিকে মেনে নিয়ে সেই সভায় যোগ দিয়ে, মডারেটরা যে-বিধান পাস করাতে চেয়েছিলেন ন্যাশন্যালিষ্টদের তাতেই স্বাক্ষর ক'রতে বলেন। এরকমভাবে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ-প্রমুখ কয়েকজন ন্যাসন্যালিষ্ট নেতা বাধা প্রদান করেন। তাঁরা মোটেই বিশ্বাস করেননি যে মডারেটরা তাদের সভায় ন্যাসন্যালিষ্টদের প্রবেশের অধিকার দিবে—এ-কথার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল—স্থতরাং তাঁরা দেশকে চেয়েছিলেন ব্রিটিশের দমননীতির সম্মুখীন হ'তে।

এর ফলে কংগ্রেস কিছুকালের জন্য স্থগিত ছিল। কিন্তু মডারেটদের অধিবেশন মোটেই কৃতকার্য হয়নি এবং তাতে খুব কম লোকই যোগ দিয়েছিল, যাদের মতের কোন বিশেষত্বই ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ আশা রেখেছিলেন যে, দেশবাসী দমন-নীতির সম্মুখীন হবার জন্য যথেষ্ট শক্তি অর্জন করবে, অন্ততঃ পক্ষে বাংলা এবং মহারাষ্ট্রদেশ, যেখানে জনমনে গভীর এবং ব্যাপকভাবে সাড়া জেগেছিল; তিনি এও ভেবেছিলেন যে সাময়িকভাবে যদি একটা বিরতিও আসে, তবুও, দমন-নীতির ফলে জনসমাজের হৃদয়ে এবং মনে একটা গভীর পরিবর্তন সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র জাতি জাতীয়তাবোধে ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঘটেছিল, এবং তিলক যখন দু'বছর পরে বার্মা জেল থেকে ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি অ্যানি বেশান্তের সহযোগিতায় কংগ্রেসকে শুধু পুনর্গঠিতই করেন নি, তাকে তিনি জাতির প্রতিনিধি ক'রে তুলেছিলেন ন্যাশন্যালিষ্টদের উদ্দেশ্যসাধনে একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানরূপে। মডারেটদল ক্রমে গুটিয়ে এসে ভদ্র-লোকদের একটি ক্ষুদ্র দলে পরিণত হ'য়েছিল এবং অবশেষে তাঁরাও পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে মেনে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

সুরাট কংগ্রেসে ঘটনার অন্তরালে থেকে এই-যে শ্রীঅরবিন্দ দেশের জাতীয় জাগরণের মোড় ফিরিয়ে দিলেন এবং বাংলাদেশের আন্দোলনকে শক্তিমান ক'রে যোদ্ধ ভাবে পরিণত করলেন বা সেখানে তিনি যে

প্লব সৃষ্টি করেন সে-খবর দেশের খুব কম লোকই জানে। ঘটনাবলীর ন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে খুব কমই ইতিহাস রচিত হয়, াইরের পরিদৃশ্যমান বস্তুসম্ভারেই তা পূর্ণ দেখা যায়।

শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায়—"পর্দ্দার আড়ালে যে চূড়ান্ত ঘটনা সংঘটিত , ইতিহাস তার খুব কমই লিপিবদ্ধ করে থাকে। ইতিহাস শুধু পর্দ্দার শ্যমান অংশটুকুকেই স্মৃতিতে ধরে রাখে। আজ খুব কম লোকই জানে যে, সদিন আমিই ছিলাম সেই হুকুম দেবার জন্য দায়ী যার ফলে কংগ্রেস ভঙ্গে গিয়েছিল। আর এই গুরুতর আদেশ আমি তিলকের সঙ্গে রামর্শ না করেই সেদিন দিয়েছিলুম। ' আমার এই আদেশের ফলে কংগ্রেসীরা নব সংগঠিত মডারেট কনভেনশানে যোগ দিতে অসম্মত য়—আর এই দুটো ঘটনাই ছিল সুরাটের দুইটি শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। এমনকি এছাড়া আমার কর্ম্মধারাই বাংলার আন্দোলনকে যে অধিকতর সংগ্রামশীল করে তুলেছিল অনেকেই তা জানেন না।"

ছয়

যোগ-শিখরে আরোহণের পথে প্রধান সহায় চিত্তের যে সমতা—'সমত্বং যোগ উচ্যতে''—তা পরিপূর্ণরূপে অর্জনের জন্য শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হন এবং ক্রমেই তিনি তাঁর ঐ সাধনায় পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেন; বরোদায় লেলের সঙ্গে মাত্র তিনদিন ধ্যান অভ্যাসের ফলে মনের নিশ্চল নীরবতা তাঁর অধিগত হয়। তারপর থেকে মনের এই অবস্থাকে তিনি সর্বদার জন্য বজায় রেখে চলতে সক্ষম হন, সব কাজ তাঁর বাইরের চেতনাতেই চলতে থাকে, আন্তর চেতনায় তার কোনো ছাপ পড়তে পায় না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১০ খৃঃ ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে কর্ম্মলিপ্ত থাকেন। কিন্তু ঐরূপ সাধারণ কর্ম্মকোলা-লের মাঝেও সর্বাবস্থায় তিনি আত্ম-সমাহিত অবস্থায় থাকতে অভ্যস্ত —'যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি'—গীতার এই বাণীকে তিনি স্বীয় জীবনে ণভাবে রূপায়িত ক'রে তুলেছিলেন—রাজনৈতিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা লেই। তিনি সাধারণ মনের ক্ষেত্র হ'তে এমন-এক ঊর্ধ্ব চেতনায় ধিষ্ঠিত ছিলেন, যেখানে কোনো চাঞ্চল্যই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসেন এবং সেজন্য তাঁর অতিমানস-সিদ্ধির প্রয়োজন হয়নি, সে সিদ্ধি আরও পরের কথা।

অতিমানস-সিদ্ধি লাভ করতে হ'লে সাধককে আগে চিত্তের সমতাকে ভিত্তি ক'রে অধ্যাত্মসিদ্ধি অর্জন করতেই হবে। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন "অতিমানস সত্তার সাক্ষাৎ কেউ পেতে পারেনা, যদি না পূর্ণতর অধ্যাত্ম সত্তার সাথে তার যোগ সাধিত হয়ে থাকে।" তিনি তাঁর নিজের সমতা এবং নিশ্চল নীরবতা অর্জন বিষয়ে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে লিখেছিলেন,— "...প্রশান্তি ও নিস্তরঙ্গতা প্রাপ্তির জন্য অতিমানস সত্তার প্রয়োজন পড়েনা। মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির ঠিক ওপরের স্তরেই রয়েছে উর্দ্ধতন বোধি সেই স্তর থেকেই তা পাওয়া যেতে পারে। সাতাশ বৎসর আগে ১৯০৮ সালে আমি দুটি বস্তু লাভ করেছিলাম। আজ আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, এগুলো আমার জীবনে দৃঢ়সম্বদ্ধ ও মাধুর্য্যময় হয়েই এসেছিল এবং এর জন্য অতিমানস সত্তার প্রয়োজন হয়নি।...আমি প্রকৃত প্রশান্তি ও নিস্তরঙ্গতাই পেয়েছিলাম—আর তার প্রমাণও রয়েছে। এর ফলে এই পরম প্রশান্তিঘন মন নিয়েই চারমাস কাল যাবৎ আমি 'বন্দেমাতরম' সম্পাদনা করেছিলাম। আর এছাড়া আর্য্যের ছয় ভল্যুমের রচনা এবং বহুতর চিঠি ও সংবাদাদি লেখার কাজও কিন্তু এই সময়ে করতে হয়েছিল তারপর থেকে আমি কত লিখেছি। তুমি হয়তো বলতে চাইবে, লেখা কোন কর্ম্ম নয়—তা কোন গতি বা আলোড়ন নয়; বরং তারই অনুরূপ একটা কিছু বস্তু—যা হচ্ছে চেতনার একটা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বিশেষ কিন্তু সেই প্রশান্তি, স্থৈর্য্যের মধ্যে থেকেই আমাকে তীব্রতম রাজনৈতিক কর্ম্ম পরিচালনা করতে হয়েছে। আর তা ছাড়া আশ্রম স্থাপনের কার্য্যে আমি আমার অংশটি গ্রহণ করেছি—বাহ্যদৃষ্টির দিক দিয়ে যার বাস্তবতা সকলেরই চোখে পড়বে।"

যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্তের এইরূপ স্থির সমতা লাভের শ্রীঅরবিন্দ সুরাট কংগ্রেসে সেই দক্ষযজ্ঞের মাঝেও ওরকম নিরুদ্বেগচিত্তে অবস্থান করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন; যে ক্ষেত্রে অপর সব নেতারা প্রাণ ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান সে-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ মৃত্যুঞ্জয়ী ভোলানাথের ন্যায় শান্ত সমাহিত চিত্তে স্বীয় আসনে সমাসীন!...শ্রীঅরবিন্দের এই নির্ভীক নির্লিপ্তভাবের পরিচয় এর পূর্বেও পাওয়া গিয়েছিল বরিশাল সভার মিছিলে

তখনও তিনি বরোদার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। বরিশালে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সেই সভা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ এবং দেশকর্মীরা মিছিল ক'রে সভাস্থলে গিয়ে পৌঁছবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সহকর্মী সুবোধ মল্লিক এবং আর-একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁর দুইপাশে নিয়ে সেই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। পুলিশের লাঠিচার্জ ইত্যাদি বাধাকে উপেক্ষা ক'রে, মিছিলের অগ্রবর্তী হ'য়ে তাঁরা সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন এবং অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা ক'রে ক্ষান্ত হয়েছিলেন। সে-বাণীর মর্মার্থ হ'চ্ছে :—"অত্যাচারী ব্রিটিশ, আজ শুনে রাখো—ভারতে তোমার রাজত্বের ক্ষয় আজ হ'তেই শুরু হলো ; সত্যসন্ধী নিরীহ জাতির এই শোণিত-হবিতে যে আগুন আজ জ্বলে উঠলো, সে-আগুন সারা ভারতময় পরিব্যাপ্ত হয়ে, ভারতে তোমার রাজত্বের পরিপূর্ণ অবসান একদিন ঘটাবে।"

বরিশালের উক্ত ঘটনার ফলে পূর্ববঙ্গবাসীর মনে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব বিশেষভাবে রেখাপাত করে। বরিশাল থেকে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যখন মৈমনসিং-এ যাওয়া হয় তখন সেখানেও গভর্ণমেণ্ট অর্ডিন্যান্স জারি করে সভা-সমিতি এবং মিছিলাদি বন্ধ করে দেয়। কিন্তু জনসাধারণ পুলিস-কর্তৃপক্ষের সে-আদেশকে অমান্য করে দলে-দলে গিয়ে হাজির হয় শ্রীঅরবিন্দকে অভ্যর্থনা করতে ; শ্রীঅরবিন্দ-সন্দর্শনে মুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হয়ে যুবকদল দেশের জন্য আত্মত্যাগের ব্রত গ্রহণে কৃতসংকল্প হয়, এমন কি, লালপাগড়ীধারী পুলিস-সিপাহীদের মধ্যেও অনেকে শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণপ্রান্তে তাদের শিরোষ্ণীষ অর্পণ করে তাঁর প্রভাবের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে। এই সব ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ তখন বুঝতে পারেন যে, প্রকৃত কাজ আরম্ভ করবার পক্ষে এই উপযুক্ত সময়। তাই উক্ত ঘটনার অনতিকাল পরেই শ্রীঅরবিন্দকে বরোদার কাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে দেখা যায় ; বরোদা কলেজের সাড়ে সাতশো টাকা বেতনের পদ ত্যাগ করে কলকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল কলেজের মাত্র দেড়শো টাকা বেতন স্বীকার করে তিনি অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন ; আর অল্পকালের মধ্যেই বরোদা এষ্টেটে তাঁর দেওয়ানের পদে উন্নীত হওয়ার স্থির সম্ভাবনাকে তিনি উপেক্ষা করে চলে আসেন। বরোদার মহারাজা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে সহজে ছাড়তে চাননি, এমন কি তিনি কলকাতা অবধি ধাওয়া ক'রেছিলেন তাঁকে বরোদায় ফিরিয়ে

নিয়ে যেতে। কিন্তু মহারাজাকে নিরাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। দেশ-সেবার জন্য এরকম ত্যাগ তখনকার দিনে অনেকে কল্পনাও করতে পারেনি, তাই শ্রীঅরবিন্দ যখন কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য সুরাটে গিয়েছিলেন তখন রেলওয়ে ষ্টেশনে এবং জনসভায় বক্তৃতা দেবার সময় 'অরবিন্দ ঘোষ' নামে মহাত্যাগী তাপসের মূর্তিটি একবার মাত্র দর্শনের আশায় অগণিত লোককে সাগ্রহে প্রতীক্ষা-নিরত থাকতে দেখা গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বারীনদা তাঁর 'আত্মকাহিনী'তে লিখেছেন—"......সেজদা'কে ধরিয়া যেখানে লইয়া বসাইয়া দেয়, নীরব মানুষটি সেইখানেই বসিয়া থাকেন, আর সবাই নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। অতবড় জনসঙ্ঘে তাঁর বক্তৃতা বড় বেশীদূর শোনা যায় না, তবু সহস্র সহস্র মানুষ ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নিজের উচ্চ পদ মান সম্ভ্রম ছাড়িয়া জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে সামান্য মাহিনায় দেশের সেবা করিতে আসিয়াছে, সে কেমন মানুষ। বন্দেমাতরমের অগ্নিমন্ত্র দিয়া সাত শতাব্দীর এত বড় অচল জগদ্দল পাথর অপসৃত করিয়া এই পাষাণে ভাব-গঙ্গা বহাইতেছে। সে কেমন জন? তাই দেখিতেই স্থানে স্থানে এত ভিড়"।

শ্রীঅরবিন্দ যখন স্বেচ্ছায় এইরূপ দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন ক'রে দেশসেবার জন্য বাংলায় ফিরে এলেন তখন তিনি বিবাহিত, তার প্রায় চার বছর আগে তিনি ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা মৃণালিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কলিকাতায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে তাঁর মেসোমশায় বিখ্যাত জননায়ক সুপণ্ডিত রামগোপাল ঘোষের বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দের বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের পর তিনি তাঁর পত্নী এবং ভগ্নীকে নিয়ে বরোদায় ফিরে যান। বরোদায় চাকুরী-জীবনে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উপার্জিত অর্থের বেশির ভাগই তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্যের জন্য খরচ ক'রে ফেলতেন এবং নিজে জীবন যাপন করতেন একজন অতি সাধারণ ব্যক্তির মতো, কারণ নিজের সুখভোগের দিকে কোন দিনই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। স্বভাব-তাপসের এ-ই স্বাভাবিক রীতি।

সুতরাং বরোদার চাকুরি ত্যাগের জন্য বঞ্চিত হ'তে হ'ল তাঁর আত্মীয় স্বজনকেই বিশেষভাবে। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু এ-সব ব্যাপারের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেননি, কারণ দেশকে বিদেশী-কবলমুক্ত করাই ছিল তখন তাঁর প্রধান ব্রত। তাই সব ত্যাগ করে তাঁর এই দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ। কারণ সাধারণ সংসারী ব্যক্তির ন্যায় শুধু নিজের আত্মীয়-স্বজনের মুখে অন্ন তুলে দিয়েই

শ্রীঅরবিন্দ সুখী এবং তৃপ্ত হতে পারেননি, ভারতের প্রত্যেকটি নরনারীকে সুখী করার মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁর জীবনের সুখ ও আনন্দ। তাঁর মনের এই গোপন কথা তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখিত গোপনপত্রে গোপনভাবে ব্যক্ত ক'রে-ছিলেন—"...আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়েছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে, আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী রহিল ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত।......ভগবানকে দেওয়ার মানে কি ? মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা উষাকে দিয়াছি, তাহার জন্য কোনো অনুতাপ নাই, পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহা ধর্ম্ম কিন্তু শুধু ভাইবোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশকোটী ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোনো মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।"

শ্রীঅরবিন্দ তখন স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, স্বদেশকে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী-কবলমুক্ত করতে না পারলে তাঁর দেশের ত্রিশকোটী ভাইবোনের প্রকৃত হিতসাধন কোনো দিনই সম্ভবপর হবে না। তাই তিনি তাঁর সেই মহান্ ব্রত উদযাপনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশোদ্ধারের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করলেন। ভারতজননী যে একদিন শৃঙ্খলমুক্ত হবেনই সে বিষয়ে পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় এবং শক্তি নিয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; তাঁর সেই অনন্ত বিশ্বাস ও শক্তির বিষয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখিত উক্ত পত্রেই ব'লেছিলেন—"আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।......কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।"

পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীর সাধনক্ষেত্রে তাঁর যোগসাধনার আরও উর্ধ্বস্তরে উন্নীত হন তখন তিনি এ-সত্য প্রত্যক্ষ করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আসবে তাঁর জীবিতকালেই এবং যোগশক্তির প্রভাবেই তা হবে সম্ভব। তাই তিনি যোগ আরম্ভ করার পর বলেছিলেন—"দেশকে মুক্ত করাই আমার যোগ-সাধনার উদ্দেশ্য।"—**"My yoga is for the liberation**

of my Country." কিন্তু কেবলমাত্র স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই শ্রীঅরবিন্দে যোগ নয়, যোগকে তিনি সমগ্র মানব-সমাজের জীবনাদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, এবং সেই জন্যই ভারতের এই অভ্যুত্থান। এ বিষয়ে শ্রীঅরবি বহু পূর্বেই "কর্ম্মযোগীন"-এ লিখেছিলেন—

"আমরা বিশ্বাস করি যে, যোগকে মানব-জীবনের আদর্শরূপে স্থাপনে জন্যই ভারতবর্ষ আজ অভ্যুত্থিত হইতেছে। এই যোগ দ্বারাই সে তাহা স্বাধীনতা, তাহার ঐক্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তি অর্জ্জন করিবে এই যোগই তাহাকে এগুলি সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে সাহায্য করিবে আমরা যে আদর্শ রূপায়ণের স্বপ্ন দেখি তাহা অধ্যাত্ম বিপ্লবের—স্থূল বহিরঙ্গ মুক্তি ইহার ছায়া ও প্রতিবর্ত্ত।"

শ্রীঅরবিন্দ এটা স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে চাকা তিনি যেভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে এসেছেন, দেশ-নেতাদের ভুলভ্রান্তি সত্ত্বে এবং শত বাধা-বিপত্তির মাঝেও আন্দোলনের সে-গতি অব্যাহত থাকবে এব তার লক্ষ্যে না পৌছানো পর্যন্ত থেমে যাবে না। এ-বিষয়ে শ্রীঅরবি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাপ্তিস্তা নামে একজন কর্মীকে তাঁর পত্রে উত্তরে লিখেছিলেন—

—"রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমি ১৯০৩ হইতে ১৯১ সাল পর্য্যন্ত একটি মাত্র লক্ষ্য লইয়া কাজ করিয়াছিলাম। দেশবাসীর মে স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জাগ্রত করিতে এবং উহা লা করার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চারিত করিতে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছিল। তৎকালী কংগ্রেসের বিভ্রান্তি ও অকর্ম্মণ্য নিষ্ক্রীয় পন্থার পরিবর্ত্তে ইহা উপস্থাপিত হয় আজ ইহা গৃহীত হইয়াছে এবং অমৃতসর কংগ্রেসের সমর্থন উহাতে পাওয় গিয়াছে।······আমি মনে করি যে, সংস্কারের অপ্রচুরতা সত্ত্বেও দেশ য তাহার বর্ত্তমান মানসিকতা ও আদর্শে অবিচলিত থাকে, আর ইহা ঠি থাকিবে বলিয়াই আমি বিশ্বাসবান, তবে এই আত্মকর্ত্তৃত্বের সঙ্কল্প শীঘ্রই রূ পরিগ্রহ করিবে।"

ঐ সময়েই, পণ্ডিচেরীতে ১৯২০ কি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর বাংলাদেশে কর্ম্মক্ষেত্রের এক শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন—"আপনি তো এখানে এে যোগ-সাধনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার কী হবে? শ্রীঅরবিন্দ এ-কথার উত্তরেও তখন শুধু বলেছিলেন—"ইহা সম্পূর্ণ হয়েছে। কারণ যোগশক্তির প্রভাবে শ্রীঅরবিন্দ এ-সত্য উপলব্ধি ক'রেছিলেন এ

তাঁর এমন দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল—মিঃ এ, বি, ক্লার্কের ভাষায়—"ইহা দৃশ্যমান জগতের গণ্ডী ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট—অরবিন্দ বোধহয় দিব্য দর্শন-ক্ষমতার অধিকারী এক পুরুষ!"—যাতে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন যে, বিশ্বনিয়ন্তার কোনো বিধান বা মহাশক্তির কোনো ইচ্ছা এই পার্থিব-চেতনায় স্থূলে রূপপরিগ্রহ করবার পূর্বে সূক্ষ্ম জগতে তার সুস্পষ্ট আভাস প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে এবং পরে, বিধিনির্দিষ্ট সময়ে, এই স্থূল জগতে তা' হয় প্রকট। ভারতের স্বাধীনতার সেই সুস্পষ্ট রূপটি শ্রীঅরবিন্দের দৈবীদৃষ্টিতে বহু পূর্বেই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল, তাই তিনি "কর্মযোগীন"-এ এ-কথা ব'লেছিলেন—"ভারতবর্ষ তার ভাগ্য-নির্দিষ্ট স্বাধীনতার দাবী রাখে।"

India claims her destined freedom.

সাত

দেশবাসীর হৃদয়ে স্বাধীনতালাভের স্পৃহা জাগ্রত করার পর সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দ এই বিশ্বের সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য, বিশেষ ক'রে, স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যৎ-সংগঠনের পন্থা নির্ধারণের জন্য পণ্ডিচেরীর সাধনক্ষেত্রে একান্তভাবে তপোমগ্ন হন! এবিষয়েও শ্রীঅরবিন্দ বাপ্তিস্তাকে তাঁর উক্ত পত্রে লিখেছিলেন—

"আমার মনকে যে চিন্তা এখন অধিকার করিয়াছে, তাহা হইতেছে, ভারত তাহার আত্মকর্তৃত্ব লাভের পর এই শক্তিদ্বারা কি কার্য সাধন করিবে? কি ভাবে সে তাহার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিবে? কোন্ কর্মধারার মধ্য দিয়া সে তাহার ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অগ্রসর হইবে?..."

যোগ-সাধনায় নিবিষ্ট অবস্থাতেও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি জগতের সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি ছিল সতত সজাগ, এবং প্রতিনিয়ত তিনি তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে পার্থিব বিবর্তনের গতিকে বাধা-বিঘ্নমুক্ত ক'রে অব্যাহত রেখে চলেছিলেন। এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনা ক'রে দেখবার চেষ্টা করবো।...ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শ্রীঅরবিন্দ যে সে-সময় কীরূপ অসীম সাহস, ধৈর্য এবং মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর লক্ষ্যের প্রতি কিরূপ অনন্যমুখী গতিতে ছুটে চলেছিলেন তার পরিচয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। বিখ্যাত মনীষী ও সাংবাদিক হেন্‌রী ডব্লু-নেভিন্‌সন্ সেই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির

বিষয় প্রকাশ ক'রে লিখেছিলেন—যার অংশ-বিশেষ ১৩৫৭ সনের পৌষ-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত হয়েছিল, যার মর্মার্থ নিম্নরূপ—

"কোনো অতিপ্রাকৃত ধর্মের যুগে জন্মলাভ করিলে অরবিন্দ ধর্মহীনদের চোখে এক ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিরূপেই প্রতিভাত হইতেন। কারণ তাঁহার মধ্যে ছিল এক কেন্দ্রীভূত ধ্যানদৃষ্টি এবং একনিষ্ঠ আনুগত্য। পার্শ্বঠুলি পরিহিত বলবান অশ্বের মত তিনি অপর কোনো-কিছুর দিকে দৃষ্টি না দিয়া তাঁহার নিজস্ব নির্দিষ্ট পথেই চলিয়াছিলেন প্রধাবিত হইয়া। কিন্তু সেই পথের শেষে তিনি এমন-এক আদর্শ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যাহা প্রেরণা-শক্তিতে এবং আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, তিনি ধাইয়া চলিয়াছিলেন মৃত্যুর পথে, সম্মুখে স্বর্গের দ্বার দেখিতে পাইয়া যাহা কোনো ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি কখনও দর্শন করে নাই। স্বাদেশিকতা তাঁহার নিকট জাতির বৈষয়িক উন্নতি অথবা রাজনৈতিক লক্ষ্য হইতে অনেক বড় বস্তু ছিল। ইহা বাস্পালোকের ন্যায় উজ্জ্বল আভায় তাঁহার চেতনার চারিভিতে ছিল বিরাজিত। যাহার দীপ্তি মধ্যযুগের সন্ন্যাসীগণ আত্মনিবেদিত শহীদদের শিরোদেশের পশ্চাতে দেখিতে পাইতেন। ভাবের গভীরতায় ও তীব্রতায় সুগম্ভীর, নিজ ভবিষ্যৎ ও অপরের নিন্দা-সমালোচনা বিষয়ে উদাসীন, স্বভাবতঃই স্বল্পবাক্—এমনই এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিরূপে তাঁহাকে আমি দেখিয়াছিলাম, স্বপ্নচারী ও আদর্শবাদী পুরুষ যে ধাতুতে গঠিত তাহাই এই মহৎ-জীবনের উপাদান ছিল—কিন্তু ইহা সেই স্বপ্নচারীরই স্বপ্ন উহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিবে কর্মময় জগতে। পন্থা বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া সে ইহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবে বাস্তব রূপে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বোম্বাই শহরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন—'স্বাদেশিকতা একটি ধর্ম, যাহা আসে ভগবানেরই নিকট হইতে'।

মাননীয় নেভিন্‌সন্ ছিলেন একজন প্রকৃত গুণগ্রাহী ব্যক্তি, তাই তখনকার দিনে শ্রীঅরবিন্দের সত্য স্বরূপটিকে তিনি এত সুন্দরভাবে অঙ্কিত ক'রে গেছেন অপূর্ব ভাষায়! তাঁর এই উক্তি শ্রীঅরবিন্দের নির্ভীক এবং সত্যকারের স্বদেশ-সাধনার অন্যতম সাক্ষ্য। এ-বিষয়ে নেভিন্‌সনের নিজের কথাগুলি, প্রয়োজনবোধে, নিয়ে উদ্ধৃত করলাম—

"In an age of supernatural religion Aurobindo would have become what the irreligious mean by a fanatic. He was possessed by that concentrated vision, that limited and absorbing devotion, like a horse in blinkers, he ran straight,

regardless of everything except the narrow bit of road in front. But at the end of that road he saw a vision more inspiring and spiritual than any fanatic saw who rushed on death with paradise in sight. Nationalism to him was far more than a political object or a means of material improvement. To him it was surrounded by mist of glory, the halo that mediaval saints behold gleaming arround the head of martyrs. Grave with intensity, careless of fate or opinion, and one of the most silent men I have known, he was of the stuff that dreamers are made of, but dreamers who will act their dreams. "Nationalism", he said, in a brief address delivered in Bombay early in 1908—"Nationalism is a religion that comes from God".

মুখ্যতঃ শ্রীঅরবিন্দের প্রচেষ্টা এবং সাধনার ফলেই যে ভারত আজ তার স্বাধিকার বুঝে পেয়েছে তা তাঁর দেশবাসী প্রায় ভুলেই গিয়েছে। কিন্তু যে আধারকে অবলম্বন করে বিশ্ব-নিয়ন্তা ভারতভূমিতে তাঁর ইচ্ছাকে রূপ প্রদান করলেন, তিনি কিন্তু তা ভোলেননি, তাই তিনি ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করলেন তাঁর সেই যন্ত্রের, সেই দিব্য-আধারের পুণ্য আবির্ভাব-দিনে—সেই দিনটিকে ভারত-সন্তানের নিকট চির-স্মরণীয় ক'রে রাখতে;—১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে ভারতবাসী ফিরে পেল তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার। শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনের সহিত ভারতের স্বাধীনতা-দিবসের এই সংযোগ যে একটা আকস্মিক এবং অর্থশূন্য ব্যাপার নয় তা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তাঁর স্বাধীনতা-দিবসের বাণীতে বলেছেন—

"August 15th is the birthday of free India .....To me personally it naturally gratifying that this date which was notable only for me because it was my own birthday celebrated annually by those who have accepted my gospel of iife, should have acquired this vast significance. As a mystic, I take this identification, not as a coincidencc or fortuitous accident, but as a sanction and seal of the Divine Power which guides my steps on the work with which I began life..."

অর্থাৎ—"১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন······।

ব্যক্তিগতভাবে স্বভাবতঃই ইহা আমার নিকট আনন্দদায়ক। ইতিপূর্ব্বে এই দিনটি শুধু আমার জন্মদিনরূপে আমার নিকট বিশেষত্বপূর্ণ ছিল এবং এই বিশেষ দিনটিতে আমার আদর্শ অনুগামীগণ প্রতি বৎসর আমার জন্মতিথি উদ্‌যাপন করিতেন। কিন্তু আজ উহাই এক বিপুল গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। এক অতীন্দ্রিয়চারী-অধ্যাত্মবাদীরূপে আমি এই দুইটি ঘটনার ঐক্যকে শুধু একটা গতানুগতিক ব্যাপার বা আকস্মিক সংগঠন রূপে গ্রহণ করিতেছি না। ইহাকে আমি সেই অধ্যাত্ম-শক্তিরই স্বীকৃতি ও নির্দ্দেশ-চিহ্নরূপে মনে করি, যে শক্তি আমার জীবনব্যাপী কর্ম্মসাধনার পথপ্রদর্শক।

সুতরাং এ-হেন ত্রাণকর্তার কর্মাবলী এবং যোগসাধনার সহিত পরিচিত হওয়া আজ জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কারণ, জাতিকে তার নিজস্ব মহিমা এবং গৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হ'লে এবং জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ ক'রে মনুষ্য-সমাজকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত ক'রতে হ'লে শ্রীঅরবিন্দ-প্রদর্শিত সমন্বয়মূলক অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধি অর্জন ক'রতেই হবে, এমন কি ঈশ্বর-প্রদত্ত তার এই স্বাধীনতাকে গৌরবের সহিত সুরক্ষিত রাখতে হ'লেও ভারতবাসীর পক্ষে যোগসিদ্ধি অতি অবশ্য প্রয়োজন। সেইজন্যই শ্রীঅরবিন্দ ব'লেছিলেন—"যোগ দ্বারা ভারতবর্ষ তাহার শক্তি সংরক্ষণ করিতে পারিবে এবং ইহার ফলে তাহার স্বাধীনতা নিরাপদ থাকিবে।" কারণ ভারতের পক্ষে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তি যে কী বস্তু তা' বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি ক'রেছেন, তাই মাননীয় রমাপ্রসাদ মুখার্জী মহাশয় একবার ব'লেছিলেন—"অ্যাটম বোমা শক্তিশালী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইতে বৃহত্তর বোমা পণ্ডিচেরীতে তৈয়ারী হইতেছে।"

বাংলাদেশে অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দ "কর্ম্মযোগীন"-এ যেভাবে এবং যে মহান্ আদর্শকে ভিত্তি ক'রে ভারতের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে গঠন করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও আবার তিনি নূতন ক'রে সে-কথা তাঁর দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"ভারতের নিজের দিক দিয়া গভীরতর সমস্যা রহিয়াছে। কতকগুলি প্রলোভনের ইঙ্গিতে সে হয়তো অন্যান্য রাষ্ট্রের মত সমৃদ্ধিশালী শিল্পবাণিজ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বৃহত্তর সংগঠন এবং বিরাট সামরিক শক্তির অধিকারী হইতে সক্ষম। রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা তাহার পক্ষে বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করাও কঠিন নয়। নিজ স্বার্থ ও অধিকার

সম্বন্ধে অবহিত হইয়া পৃথিবীর বিরাট ভূভাগ অধিকার করাও তাহার পক্ষে হয়তো সম্ভবপর। কিন্তু বহির্জগতের এই চমকপ্রদ সাফল্যের মধ্যে গিয়া সে তাহার স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে—আত্মাকে হারাইয়া ফেলিবে। প্রাচীন ভারতের বিশেষত্ব এবং তাহার অধ্যাত্মবাদ ইহার ফলে নিশ্চিতরূপে তিরোহিত হইবে এবং আমরা পৃথিবীর অপরাপর জাতির মতই আর একটি জাতিরূপে পরিগণিত হইব। ইহা সমগ্র বিশ্বের অথবা আমাদের কাহারও পক্ষে লাভজনক নহে। বহিরঙ্গ জীবনকে নির্দোষভাবে সমৃদ্ধতর করিতে গিয়াও ভারত তাহার বহুদিন সঞ্চিত মূল্যবান অধ্যাত্ম সম্পদ হারাইবে কিনা এই প্রশ্নও এখানে উঠে। কিন্তু যে সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশ ক্রমশঃই অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে ঝুঁকিতেছে, ভারতের সাহায্য ও রক্ষাকারী আলোকের দিকে মুখ ফিরাইতেছে ঠিক সেই সময়েই আমাদের বিরাট অধ্যাত্ম-সম্পদের উত্তরাধিকার ত্যাগ করাও যেন এক বিরাট দুর্ভাগ্য। ইহা ঘটা উচিত নয়—ইহা যেন কিছুতেই না ঘটে।"

* * *

কী গভীর দূরদৃষ্টি নিয়ে যে শ্রীঅরবিন্দ এই বিশ্বের সমগ্র মানব-সমাজের জীবন-সমস্যার সমাধানের অপূর্ব সব বিধান ও নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা' অনুধাবন ক'রলে বিস্মিত হ'তে হয়! আজ এশিয়া ভূখণ্ডের বিভিন্ন জাতি তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্ত্য শক্তির কবলমুক্ত হবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াবার যে প্রচেষ্টা করছে, এশিয়া যে আজ সংঘবদ্ধভাবে নব উদ্দীপনায় জেগে উঠছে, তার এই জাগৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপ শ্রীঅরবিন্দের দূরদৃষ্টিতে ভেসে উঠেছিল বহুপূর্বে, জগতের মঙ্গলের জন্য যে ভারতের তথা এশিয়ার পুনরুত্থান প্রয়োজন তা' তিনি তখন গভীরভাবে উপলব্ধি ক'রেছিলেন। বাংলা দেশের কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকাকালেই তিনি বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ঊর্ধ্বতর সত্যের ধর্মে জীবন-গঠনের জন্য যাত্রা শুরু ক'রতে। তাই তিনি "কর্মযোগীন"-এ লিখেছিলেন—

"মানব-সমাজের কল্যাণের জন্যই ভারতবর্ষকে আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে।—যে স্বাজাত্যবোধের আদর্শবাদ আমরা প্রচার করি ও অনুসরণ করি তাহার নিহিতার্থ ইহাই। আমরা মানবজাতিকে ডাকিয়া বলিতে চাই—সময় উপস্থিত। আজ তোমরা অগ্রসর হও, বস্তুতান্ত্রিকতার বন্ধন কাটিয়া মহত্তর, গভীরতর ও বিস্তৃততর জীবন-লোকে প্রবিষ্ট হও; ইহার দিকেই মানবসমাজ আজ অগ্রসরমান। যে সমস্যা বর্তমানে মানুষকে প্রপীড়িত

করিতেছে তাহার সমাধান নির্ভর করে অন্তর্লোকের রাজ্য বিজয়ের উপর।··
ইহার জন্য প্রয়োজন এশিয়ার পুনরভ্যুত্থান। তাই তো এশিয়া আজ উত্থিত
হইতেছে।”

আজ জগতের দুইটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে যে মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'য়েছে, এব
এই দ্বন্দ্বের অবসানকল্পে জগতের কোনো-কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি, দুইটি শক্তি
মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, দুই শক্তির ভিন্ন দুই আদর্শকে পাশাপাশি
সংরক্ষণের যে সম্ভাবনার বিষয় চিন্তা ক'রে দেখছেন, সে সম্ভাবনার কথ
শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু আগেই চিন্তা ক'রে দেখেছিলেন এবং সে বিষয়ে তিনি তাঁ
“আইডিয়েল অব হিউম্যান ইউনিটি”র শেষের দিকে এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও দিে
গেছেন—

তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে: “বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির দুঃসহ ও যাতনাম
অংশটুকু পরিবর্তিত হইতে পারে এবং মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সহাব
স্থানের ধারাও উন্নততর হইতে পারে।” যদি তাহাদের এই অশান্তি, অনিবার্য
সংঘাতের আশঙ্কা, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসহিষ্ণুতা চলিতে থাবে
তাহার মূলে রহিয়াছে বিশ্বময় প্রভুত্বের জন্য আক্রমণাত্মক আদর্শবাদকে ব্যবহা
করার ইচ্ছা। ইহাই বিভিন্নজাতিকে আতঙ্কিত করিয়া রাখে এবং সামরি
প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত রাখিতে চায়, কারণ তাদের ধারণা ঐ বিপরীতধর্ম্মী
আদর্শের মিলন অসম্ভব। যদি এই মনোবৃত্তিকে বর্জ্জন করা যায়, তবে এ
পৃথিবীতে এই দুই সংঘাতশীল আদর্শের পক্ষে একত্র বাস নিতান্ত অসম্ভ
হইবে না। কারণ নিখিল বিশ্ব বৃহত্তর রূপান্তরের মধ্য দিয়া এক সার্বভৌ
রাষ্ট্রতান্ত্রিক বিবর্তনের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। উহা মানব-সমাজে
নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং ফলে বিশ্বের একদিকে থাকিবে কতকগুলি সমাজতান্ত্রি
রাষ্ট্র আর অপর দিকে দেখা যাইবে জাতি-সমূহের সমন্বয় এবং ধনতান্ত্রি
জীবনাদর্শের রূপান্তর সাধন, যাহার মধ্যে সার্বজনীন প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধ
গড়িয়া উঠিবে। এমন কি ইহার ফলে একটি বিশ্বরাষ্ট্র বিবর্তিত হইবে, যাহা
ফলে প্রত্যেক জাতি তাহার স্বকীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বজায় রাখিয়াও শান্তিে
পাশাপাশি বসবাস করিতে পারিবে, ইহার ফলে একটি এককেন্দ্রিক বি
সংহতি গড়িয়া উঠা অসম্ভব হইবে না, এই শ্রেণীর সার্বভৌম বিশ্বরাষ্ট্
অগ্রগামী দিনের এক চূড়ান্ত ও অপরিহার্য্য বিবর্ত্তন।”

সেদিন ভারতীয় কংগ্রেস তার 'আবাদি'র অধিবেশনে যে সোস্যালিষ্ট
প্যাটার্ণ-এ ভারতের সমাজ সংগঠনের সংকল্প গ্রহণ ক'রলো এ সম্ভাবন

বিষয়েও শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেছেন। কোনো বৈদেশিক নীতি বা মতবাদ (ইজম্) অনুসরণ ক'রে যে ভারত তার আসল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না তা' আজ দেশের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ হৃদয়ঙ্গম করছেন, তাই তাঁরা ভারতের স্বধর্মকে ভিত্তি ক'রে সমাজ-সংগঠনের বিষয় আজ ভেবে দেখতে চাইছেন। এ-বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ শ্রীঅরবিন্দ "কর্মযোগীন"-এ বহু পূর্বেই দিয়ে গেছেন—

"আমাদের ধর্ম ও সমাজ-জীবনের পক্ষে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইতেছে প্রাণবন্ত ও খাঁটি শক্তি-প্রবাহের ধারা। ইহাই শুধু আমাদের সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে সক্ষম। আমাদের শিল্পবাণিজ্য-জগৎকেও ইহা পুনরুজ্জীবিত ও রূপান্তরিত করিতে পারে। শুধু তাহাই ইহার ফলে জাগ্রত হইয়া উঠিবে—এমনতর সর্ববিজয়ী কলাশিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন যাহা মনে-প্রাণে খাঁটি ভারতীয়—ইউরোপীয় তাহা মোটেই নয়।"

আট

জগন্মাতা মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য এবং এই পার্থিব-চেতনার বিধি-নির্দিষ্ট রূপান্তর সাধনের জন্য মানুষকে পেতে চান তাঁর যন্ত্ররূপে, তাঁর কর্মের নিষ্ঠাবান সহযোগীরূপে। বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁর সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই দিয়ে রেখেছেন তার পন্থানির্বাচনে কতক পরিমাণে স্বাধীনতা, তার জীবনে মঙ্গল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শুভশক্তির শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ, এবং বুদ্ধি। অধিকন্তু, আমরা এ-ও জানি যে, যুগ-প্রয়োজনে পরাৎপর পরমেশ্বর স্বয়ং এই পৃথিবীতে মানবদেহে অবতীর্ণ হ'য়ে মানুষকে শুভ এবং সঠিক পথের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তার কল্যাণের জন্য। কিন্তু বুদ্ধি-গরবী এবং অহংভাবাপন্ন মানুষ অবতারপুরুষের সে-নির্দেশকে সহজে মেনে নিতে পারে না, যার ফলে সমাজ-জীবনে দেখা দেয় মহা অনর্থ এবং দুর্ভোগ, যে দুর্ভোগ এবং অমঙ্গল দেখা দিয়েছিল ভারতবাসীর জীবনে—শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশকে প্রত্যাখ্যানের ফলে। একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা ক'রেছি যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগদৃষ্টির সহায়ে স্পষ্ট দেখতে পেতেন জগতের ঘটনাবলীর অন্তরালে কোন্ সত্য নিহিত আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজ যখন ভারতে ক্রীপস্-প্রস্তাব পাঠান তখন শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্ট দেখেছিলেন যে, সেই প্রস্তাব-প্রেরণের মাঝে, ভারতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার বিষয়ে,

ইংরাজের সত্যকারের একটি সদিচ্ছা নিহিত আছে, ভারতকে ফাঁকি দিবার কোনো অভিপ্রায় সেখানে নাই, তাই তিনি ভারতে উক্ত প্রস্তাব আসার সঙ্গে-সঙ্গেই দেশনেতাদের নির্দেশ প্রদান করেন সেই প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে। কিন্তু তখন দেশের সর্বেসর্বা নেতা শ্রীঅরবিন্দের সেই নির্দেশের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না, বা শ্রীঅরবিন্দ ৩০ বছর পরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে রাজনৈতিক-কারণে আবার কেন-যে মুখ খুললেন তা' একবার ভেবে দেখাও প্রয়োজন বোধ করলেন না, উপরন্তু তিনি শ্রীঅরবিন্দের ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর সে নির্দেশকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। সে সময় একমাত্র পরলোকগত ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধেয় বি, সি, চ্যাটার্জী মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের সেই নির্দেশের অন্তর্নিহিত সত্যটি ধরতে পেরেছিলেন এবং সে সময় (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে) ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের এক জন্মোৎসব সভায় বক্তৃতাকালে তিনি উক্ত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন—

"আজ আমি আমার দেশবাসীকে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখতে বলি, কেন শ্রীঅরবিন্দ এই যুদ্ধে ইংরাজকে সমর্থন করছেন এবং ভারতবাসীকে ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলছেন। শ্রীঅরবিন্দের যে এর ভেতর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই এ-কথা নিশ্চয়ই সকলে বলবে। সুতরাং তাঁর কাজ দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, যুক্তশক্তি আজ পৃথিবীর সভ্যতা সংরক্ষণের জন্যই এই যুদ্ধে ব্যাপৃত, এবং সেইজন্যই তিনি তাঁর দেশবাসীকে ক্রীপ্‌সের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইংরাজের সহিত আপস ক'রতে বলছেন। চীৎকারটা কিছু কমিয়ে একটু গভীরভাবে যদি চিন্তা ক'রে দেখি তা' হ'লে তাঁর কথার সারবত্তা উপলব্ধি করতে আমাদের দেরী হবে না।"

কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে,—দেশের সর্বাধিনায়ক তখন যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন প্রচারে ব্যস্ত, দ্রষ্টা ঋষির মহাবাক্য তখন তিনি শুনবেন কেন? ঋষিবাক্য প্রত্যাখ্যানের ফলে দেশকে যে অবর্ণনীয় সব দুর্ভোগ এবং ক্ষতি সইতে হ'য়েছে এবং এখনও হ'চ্ছে তা' আর বিশ্লেষণ ক'রে বলার প্রয়োজন করে না। শ্রীঅরবিন্দ কেন ক্রীপস্-প্রস্তাব মেনে নিতে ব'লেছিলেন দেশ-বিভাগের পর দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তা উপলব্ধি ক'রেছেন। তাই ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে দিল্লীতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে ভারতের তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় কে, এম, মুন্সী মহাশয় তাঁদের ভুলের কথা অকপটে স্বীকার ক'রে ব'লেছেন—

"১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হইলে সমগ্র ভারত নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ

করিতে চাহিয়াছিল। সেই সময়ে তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) তাঁহার অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি দ্বারা বুঝিয়াছিলেন, এ যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জয়ের অর্থ হইতেছে দানব-শক্তির উপর বিজয়লাভ। আমরা ইহাতে সে সময় ক্রুদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু ইহার বাস্তবতা পরে প্রমাণিত হইয়াছে। মিত্রশক্তি যুদ্ধে বিজয়ী হইতে না পারিলে মানবজাতির উপর ফ্যাসিসিজম্-এর কালো মেঘ নামিয়া আসিত।

"স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ তাঁহার প্রথম প্রস্তাব নিয়া যখন আসেন, তখন আবার ইনি স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'ভারতের পক্ষে ইহা গ্রহণ করাই উচিত।' আমরা সে উপদেশ তখন গ্রাহ্য করি নাই। আমরা যাহারা তখন ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছি, তাহাদের মতের পিছনে তখন অবশ্যই যুক্তি ছিল। কিন্তু আজ আমরা উপলব্ধি করিতেছি, সেই প্রথম প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হইত, তবে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইত না, বাস্তুহারা বা কাশ্মীরের সমস্যাও আজ থাকিত না।"

* * *

আজ এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে, ভারতের নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের এই মর্মন্তুদ দুঃখ-দুর্দশার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী—পন্থা-নির্বাচনের ব্যাপারে দেশ-নেতাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তাঁদের কর্ম। সুতরাং মানুষের জীবনের মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করে তার আচরিত কর্মের উপর, তাই বলা হ'য়ে থাকে—'যেমন কর্ম তেমনি ফল।' জীবনে শুভ ফল পেতে হ'লে মানুষের কর্ম এবং চিন্তা সর্বাঙ্গীণরূপে শুভ এবং তার পন্থা-নির্বাচন তার অন্তঃপুরুষের নির্দেশমতো হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও 'কর্ম'কেই জীবনের শুভাশুভ এবং ভয়-অভয়ের কারণ বলে স্বীকার করা হ'য়েছে—

"কর্মণা জায়তে জন্তু ; কর্মনৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মনৈবাভিপদ্যতে॥

১০ম স্কঃ ২৪ অঃ

"এই জীবলোক এক কর্মের দ্বারাই উৎপন্ন এবং কর্মের দ্বারাই প্রলীন হইতেছে। সুখ, দুঃখ, ভয় ও অভয় সমস্তই তাহাদের কর্মের দ্বারাই ঘটিতেছে।"

পৃথিবীর এই যুগ-সন্ধিক্ষণে মানুষের এখনও যদি শুভবোধ জাগ্রত না হয়, মানুষ যদি সব বিভেদ-বিসম্বাদের ঊর্ধ্বে উঠে জগন্মাতার কর্মের সহায়রূপে এখনও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়, তবে মানুষকে তার কর্মের ফলস্বরূপ মহাধ্বংসের কবলে গিয়ে পড়তে হবে। এবং সেই ধ্বংসের পর মানুষকে

আবার নূতনভাবে, বহু কষ্টে একটা অনিশ্চয়তার মাঝে আরম্ভ করতে হবে তার জীবন-প্রগতি। কিন্তু একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে, এই পৃথিবীতে মহাশক্তি এক উন্নততর এবং মহত্তর, এমন-কি, অতিমানব জাতির সৃষ্টির দ্বারাই এই মর্ত্যভূমিকে ক'রে তুলবেন সার্থক, তাঁর এই পৃথিবী-সৃষ্টির উদ্দেশ্য তখনই হবে সফল। এ-বিষয়েও শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "আইডিয়েল অব হিউম্যান ইউনিটিতে" সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন—

"মানবজাতির অন্তর্লোকে অধিষ্ঠিত যে দেবতা তাহার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছিলেন, আজ তিনি মানুষের অন্তরে ও মনে নবতর উজ্জীবনের আশা ও ধ্যান-কল্পনা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। পুরাতন সমাজ ও সভ্যতার কাঠামোকে বিদায় দিয়া আজ তাহা এমন পরিবেশ রচনা করিতে চায় যাহা স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণকে আবাহন করিয়া আনিবে। ইহাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সর্বমানবের ঐক্য ও সংহতি সম্বন্ধে আস্থা জাগ্রত করিবে—যাহা এতদিন গুটিকয়েক লোকের ধ্যানেই সীমাবদ্ধ ছিল, যাহাকে এতদিন বিরাট মায়া কল্পনারূপেই অবজ্ঞা করা হইত। কিন্তু ইহাই একদিন শান্তি ও ঐক্যের সুদৃঢ় ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিয়া উঠাইবে, মানবের সুরম্য স্বপ্নকে ইহা রূপায়িত করিয়া তুলিবে। জাতি ও সমাজের পূর্ণতর অভিব্যক্তি—মানবের মানবাত্মার ঊর্ধ্বায়িত বিবর্তনই আজ আমাদের লক্ষ্য।

"আজিকার অথবা আগামীকালের মানুষকেই কিন্তু এই উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। কারণ দীর্ঘদিন এই অভিযাত্রাকে বিলম্বিত করা চলে না; বারংবার বিফল হইবারও একটি প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। ইহা এক ক্রমবর্ধমান সঙ্কটকেই ত্বরান্বিত করিবে, যাহার ফলে সমাজ-জীবনে হয়তো এক ধ্বংসকারী বৈকল্যের সৃষ্টিও করিয়া বসিতে পারে। সমস্যার প্রকৃত সমাধান ইহার দ্বারা বিঘ্নিত হইতে বাধ্য। ইহার ফলে শুধু আধুনিক বিশ্ব সভ্যতাই নয়, সমগ্র মানব-সভ্যতাই এক অনিবার্য্য ধ্বংসের মধ্য দিয়া বিলুপ্ত হইতে পারে। তাহার পর কিন্তু এই গোলযোগ ও ব্যাপক ধ্বংসের পর মানুষকে তাহার নূতন পথের অনিশ্চিত ক্ষীণ রেখাটি ধরিয়া হয়তো অগ্রসর হইতে হইবে। একটি উন্নততর মানবজাতি বা মহামানবগোষ্ঠীকে গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত সূত্রটিকে পাইতে পারিলেই যেন আজ আমরা এক সফলতর সৃষ্টির সন্ধান পাইতে পারিতাম।"

সুতরাং মহা ধ্বংসের কবল থেকে এবং মহা অন্ধকারে নিমজ্জন থেকে মানবজাতিকে রক্ষা পেতে হ'লে ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে শুভ বোধ জাগ্রত

হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনে ভারতের দায়িত্ব সর্বাধিক। কারণ, মানুষের অধ্যাত্মদৃষ্টি উন্মুক্ত না হ'লে তার মাঝে শুভ বোধ কোনোদিনই চিরস্থায়ী হবে না, আর প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞানের আকর হ'চ্ছে এই ভারতভূমি। শ্রীঅরবিন্দ ব'লেছেন—জগতে অধ্যাত্মশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে ভারত হচ্ছে জগতের গুরু। জগদ্বাসীর অধ্যাত্মযজ্ঞানুষ্ঠানে সে পৌরোহিত্যের কাজ প্রথম আরম্ভ ক'রেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। জগতের ধর্মসভায় জগদ্বাসী ভারতের সেই বিজয়ী বীরকে প্রথম বরণ ক'রে নিয়েছিল গুরুরূপে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ব'লেছিলেন—

"গুরুর চিহ্নিত শিষ্যরূপে বিবেকানন্দ অগ্রসর হইলেন—এই শক্তিমান বীর যেন জগৎটাকে তাঁহার দুই হাতের মধ্যে লইয়া তাহাকে পরিবর্তিত করিতে সমর্থ। তাঁহার এই গতি বুঝাইয়া দিল ভারতবর্ষ শুধু জাগ্রতই হয় নাই, বিশ্বকে জয় করিতেই সে জাগ্রত হইয়াছে।"

অধ্যাত্মরাজ্যে জগদ্বিজয় স্বামীজীর জীবনের একটি স্বপ্ন ছিল, তাই তিনি ব'লেছিলেন—

"ভারতবর্ষ আর একবার পৃথিবীকে জয় করিবে। ইহাই আমার সমগ্র জীবনের স্বপ্ন। আজ যাঁহারা আমার কথা শ্রবণ করিতেছেন তাঁহারাও এই স্বপ্নই দর্শন করিতে থাকুন—ইহাই আমি চাই। আর এই স্বপ্ন সফল না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা থামিয়া না পড়েন।"

জয়

জগতের অধ্যাত্মক্ষেত্রে পূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য শ্রীঅরবিন্দ ভারতকে দিয়ে গেছেন এই বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির গ্রহণোপযোগী সর্বসমন্বয়মূলক ভারতেরই এক পূর্ণতর অধ্যাত্মশিক্ষা। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ মতো, সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য, দেশকে গ'ড়ে তুলতে হ'লে তাঁর শিক্ষা এবং সাধনাকে জনসমাজে ব্যাপকভাবে পরিবেশন করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের জন্য, মানব সম্প্রদায়ের জন্য, অপূর্ব শিক্ষা-সম্পদ এবং সাধনধারা ভারতের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণভাবে সাজিয়ে রেখে গেছেন,—কোনোকিছুই তিনি অপূর্ণ রেখে যাননি। তাই শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণে শ্রীমা আমাদের হয়ে তাঁর শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি নিবেদন ক'রে বলেছেন—

"আমাদের চৈতন্যময় প্রভুর স্থূল আবরণস্বরূপ যে তুমি রয়েছ, তাকে

জানাই আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা! যে তুমি আমাদের জন্য ত্যাগ, কর্ম দ্বন্দ্ব-সংঘাত সব কিছুর মধ্য দিয়ে এত দুঃখ বরণ করেছ, এত প্রতীক্ষা, আশা মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছ—সেই-তোমাকে জানাই আমাদের নতি আমাদের সমগ্র চিন্তা ও প্রচেষ্টা, প্রস্তুতি ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে যে সর্বাত্ম সাধনা তুমি সমাপ্ত করেছ আমাদের প্রণাম রইলো তারই জন্যে। সেই তোমার কাছেই নত শিরে আজ প্রার্থনা জানাই—তোমার কাছে আমরা সমস্ত যা-কিছু পেয়েছি, তার ঋণ যেন আমরা কোনকালে বিস্মৃত না হই।"

পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দের যোগে সহায়তার জন্য এবং তাঁর শিক্ষা সাধনাকে মানব-সমাজে বিতরণের জন্য সুদূর ফরাসী দেশ থেকে শক্তিস্বরূপ শ্রীমা নিজের সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে এসে দাঁড়ালেন শ্রীঅরবিন্দের পাশে। কারণ শ্রীমা তাঁর ঐশীদৃষ্টির সাহায্যে এ-সত্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দে সমন্বয়মূলক ভারতের অধ্যাত্মধর্মই জগতের সমগ্র মানবের ধর্ম এবং সে-ধ শ্রীমায়ের স্বীয় উপলব্ধিগত ধর্মের সহিত সম্পূর্ণ এক সুতরাং শ্রীঅরবিন্দকে এব তাঁর শিক্ষা ও সাধনাকে ভাল ক'রে বুঝবার এবং জানবার তাঁর দেশবাসী পক্ষে—বিশেষ ক'রে বাঙ্গালী-সমাজের পক্ষে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশকে দেখেছিলেন এক নূতন দৃষ্টিতে, তা তিনি দুর্গা-স্তোত্রে ব'লেছেন—"সব সৌন্দর্য্য-অলঙ্কৃতা জ্ঞান প্রেম শক্তি আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি।" বাংলাদেশের, বাঙ্গালী জাতির আন্ত বৈশিষ্ট্য শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে সুস্পষ্টরূপে ধরা প'ড়েছিল, সেইজন্য তিনি বাঙ্গালিকে এত সহজে মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলো। কিন্তু বাঙ্গাল জাতির শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, আর কোথায় তার দুর্বলতা এবং অভাব তাও তিনি ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, সে-বিষয়ে 'পণ্ডিচেরীর পত্রে' তিনি বহু পূর্বেই লিখে ছিলেন—বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের সামর্থ্য আছে, ইনটুইশ অন্তর্জ্ঞান) আছে; এই সব গুণে সে ভাবতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই কিন্তু এইগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে তা' হ'লে বাঙ্গাল ভারতের কেন, জগতের নেতা হ'য়ে যাবে।"

শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী প্রয়াণে কিছুকাল পরে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ মানসে যখন পণ্ডিচেরী গিয়েছিলে তখনও কথা-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী সম্বন্ধে তাঁর মনে কথা ব্যক্ত করেছিলেন, যে প্রসঙ্গের বিষয় শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের প

অবিদা' ১৩৫৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'গল্প ভারতী'তে প্রকাশ ক'রেছিলেন, যার কিয়দংশ হ'চ্ছে: "...তবু আমি চাই—পতিত ভারতমাতা আবার মহিমান্বিত হ'য়ে ওঠে, আরও চাই কাকেও ছোট না ক'রে আমার মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ক'রে গ'ড়ে তুলতে—সে আমার বাংলা-মা। বাঙ্গালী সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এ আমার মনোগত কামনা।"

যে বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতির বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ এতো উচ্চ আশা পোষণ ক'রেছিলেন, তাঁর সেই আশাকে রূপায়িত ক'রে তোলবার জন্ম বাঙ্গালীর পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ও সাধনার প্রতি আজ অবহিত হওয়া অতি প্রয়োজন এবং শ্রীঅরবিন্দ কে ছিলেন, আর কেনই-বা তিনি আমাদের মাঝে এসেছিলেন তা উপলব্ধি করাও একান্ত দরকার। বাঙ্গালী তার হৃদয়ের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে জানে। যাতে বাংলার প্রতিটি নরনারী মানব-মুক্তিদাতা যুগাবতার শ্রীঅরবিন্দের জীবন-মাহাত্ম্যের অতি সামান্যমাত্রও উপলব্ধি করতে পারে সেজন্য বাংলার কর্মী, মনীষী, সাহিত্যসেবী এবং সংবাদপত্রসেবীদের আজ অগ্রণী হ'তে হবে—শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা এবং সাধনাকে মানব-সমাজে পরিবেশনের কাজে। সুতরাং এইবার আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবনী, রাজনীতিক্ষেত্রে তথা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর অবদান, তাঁর কর্মাবলী এবং তাঁর যোগপন্থার বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে তাঁর সম্পূর্ণ এবং অন্তর্নিহিত জীবন-চরিত অঙ্কিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ শ্রীঅরবিন্দের জীবন এবং তার আন্তর-রহস্য মানুষের বহির্দৃষ্টির অবলোকনের বস্তু নয়। শ্রীঅরবিন্দ এ-বিষয়ে স্বয়ং একবার বলেছিলেন—

"কেউই আমার জীবনী লিখতে পারবে না, কারণ লোকের দৃষ্টিতে পড়বার মত বাইরের জিনিস তা নয়।"

তবে তাঁর জীবনের কর্মাবলী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যকে ভিত্তি ক'রে তাঁর একাধিক জীবনকথা রচিত হয়েছে। "শ্রীঅরবিন্দ এণ্ড হিজ আশ্রম" নামে শ্রীঅরবিন্দের নিজ সমর্থনে ইংরাজীতে তাঁর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে এবং অন্যান্য প্রামাণ্য পুস্তকাদি থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তারই কিছু পরিচয় এবার দিচ্ছি।

জন্ম

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট বৃহস্পতিবারে ঊষাগমের পূর্বমুহূর্তে শ্রীঅরবি
কলিকাতা মহানগরীতে থিয়েটার রোডে (অধুনা শেক্‌সপীয়র সর
শ্রীঅরবিন্দ ভবন) তাঁর পিতৃদেবের বন্ধু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাসগৃ
জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের পিতা তখন তাঁর বন্ধুর গৃহেই বাস করতেন
ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ডাঃ কৃষ্ণধনের একজন অন্তরঙ্গ ব
ছিলেন, তাঁর বন্ধুর নামের স্মৃতিস্বরূপ ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁর দ্বিতীয় পুত্রে
নাম রাখেন 'মনোমোহন'। ডাঃ কৃষ্ণধনের এই দ্বিতীয় পুত্র শ্রদ্ধে
মনোমোহন ঘোষ মহাশয় পরবর্তীকালে ইংরাজী সাহিত্যের যশস্বী কবিরূ
খ্যাতি অর্জন করেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকরূপে, তা শিক্ষিত সমা
সুবিদিত।

সেই ১৫ আগস্টে শিশু-অরবিন্দকে অবলম্বন ক'রে সেই মহা শুভক্ষণে এ
পৃথিবীতে কোন্ শক্তির আবির্ভাব হ'ল তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি
১৫ই আগস্টে প্রকাশিত সত্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে--

"The fifteenth August is a day of awakening of the birth (
the Spirit into the truth of manifestation into the hidden realit
of the world."

অর্থাৎ "১৫ই আগস্ট হ'চ্ছে জাগৃতির দিবস, তুরীয় আত্মার জন্মপরিগ্রহে
দিবস—সৃষ্টির প্রকাশের সত্যে জগতের সুগোপন রাজ্যে।"

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য নিহিত আছে ঐ কথা-কয়টি
মধ্যে।...এই পৃথিবীতে যুগে-যুগে অবতারপুরুষ এলেন অধর্মকে দূরীভূত ক'
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে, ধরিত্রীবক্ষ থেকে সব কলুষকে নাশ ক'রে শু
সৎকে সংস্থাপন করতে। সেই উদ্দেশ্যে মহাশক্তি স্বয়ং আবির্ভূতা হ'য়ে ব
দৈত্য-দানবকে ধ্বংস করলেন সময়ে-সময়ে। দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এ
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'য়ে মানব-প্রগতিবিরোধী বহু অসুরশক্তির নিধন সাধ
করলেন। কিন্তু কালের ক্রূরসত্তা কালীয় নাগকে তিনি এই পৃথি
থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করলেন না। সেই ক্রূরতার প্রভাব থেকে তি
ব্রজবাসীদের সাময়িকভাবে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু সেই ক্রূর সত্তা
তিনি রেখে দিলেন এই পার্থিব-চেতনার গোপন রাজ্যে। শ্রীকৃষ্ণ কে
এরূপ করলেন, তা তিনিই জানেন, আমরা একে তাঁর লীলা ছাড়া আ

কিছুই বলতে পারি না।···তাই সেই ক্রুর শক্তি তার সেই গোপন রাজ্য থেকে বার-বার নানারূপে উত্থিত হ'য়ে মানুষের ঊর্ধ্ব প্রগতির পথে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে চলেছে। বর্তমান যুগে তুরীয় ভূমির আলোক অসুরের সেই গোপনপুরীকেও বিদ্ধ করবে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"**The Light shall invade the darkness of its base.**"

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট পরমাত্মা যখন এই মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হলেন তখন তার প্রভাব গিয়ে পৌঁছলো অসুর-রাজ্যের সেই গোপনপুরে—তার ভিত্তির নিম্নতম স্তরে। অসুরশক্তি তখন বুঝলো তার রাজ্যকালের শেষ সময় আসন্ন। কিন্তু সহজে রাজ্য ছেড়ে দেওয়া অসুরের ক্রুর শক্তির স্বভাব নয়, তাই অমিত বিক্রমে সে-শক্তি উঠলো জেগে; নানা রূপে, এমন-কি এই পৃথিবীর মানবরূপী দানবকে অবলম্বন ক'রে সে-শক্তি মানব-প্রগতির পথে পূর্ণ পরাক্রমে বাধার সৃষ্টি করতে লাগলো। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার তার প্রমাণ। কিন্তু হিটলারকে অবলম্বন ক'রে বিরুদ্ধশক্তি তার কাজ হাসিল করতে পারলো না,—১৫ই আগস্টে আবির্ভূত শক্তির কাছে তাকে নিহত হ'তে হ'ল। এই ১৫ই আগস্ট দিনটির উপর সেই ক্রুর শক্তির যত আক্রোশ! হিটলারও চেয়েছিল ১৫ই আগস্ট তারিখে বাকিংহাম প্যালেসে প্রবেশ করতে অর্থাৎ ইংলণ্ড জয় করতে।···মুশলিম লীগকে অবলম্বন ক'রে সেই বিরুদ্ধশক্তি এক ১৫ই আগস্টের রাত্রে কলকাতার সমস্ত হিন্দুকে চেয়েছিল নিশ্চিহ্ন করতে, এমন-কি ঐ ১৫ই আগস্টে সেই বিরুদ্ধশক্তি শ্রীঅরবিন্দের তপস্যাক্ষেত্রের উপরও আক্রমণ চালিয়েছিল ভারতের একটি স্বধর্মবিরোধী দলকে অবলম্বন ক'রে। যার ফলে ভারতে সেই দলের শক্তি ক্রমেই হ্রাস পেয়ে চলেছে। কিন্তু বর্তমানে সে-শক্তি তার শেষ কামড় দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে! কিন্তু আবির্ভূতা মহাশক্তির হাতে তার নিঃশেষ বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

যুগ-যুগ ধ'রে যে শক্তি এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বাধার সৃষ্টি ক'রে এসেছে এবং অবতারপুরুষদের আবির্ভাব ও কর্মের ফলে অনেকাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েও যা এখনও সবংশে নির্বংশ না হ'য়ে পার্থিব-চেতনার গভীরে পর্যন্ত অস্তিত্ববান রয়েছে, সেই শক্তিকে তার সেই গভীর তল হ'তে সম্পূর্ণরূপে জাগিয়ে তুলে চিরতরে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে এই পৃথিবীতে মানব-প্রগতির পথকে মুক্ত ক'রে দিয়ে আলোকের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল শ্রীঅরবিন্দরূপে তুরীয় শক্তির এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্থূল আবরণের বাইরে গিয়ে চেতনার গভীরে আরও পরিপূর্ণ শক্তিতে এই পার্থিব-চেতনার পূর্ণ রূপান্তর সাধনের জন্য এখনও এই পৃথিবী-মণ্ডলেই কর্মনিরত আছেন।....এবিষয়ে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের কাছে নিশ্চয়-বাণী পেয়ে লিখেছিলেন—

"ভগবান, আজ প্রাতে তুমি আমায় কথা দিয়েছ নিশ্চয় ক'রে যতদিন তোমার কাজ সম্পূর্ণ না হবে ততদিন তুমি থাকবে আমাদের কাছে, শুধু দিশারী আলোকারী চৈতন্যরূপে নয়, তুমি নিজে উপস্থিত থাকবে কর্মেরও মধ্যে জাগ্রতভাবে। অভ্রান্ত কথায় তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তোমার সবখানি থাকবে এখানে, পৃথিবীমণ্ডল পরিত্যাগ করবে না যতদিন পৃথিবী রূপান্তরিত না হয়। তাই আমাদের প্রার্থনা : তোমার এই অপরূপ জাগ্রত উপস্থিতির যোগ্য যেন আমরা হ'তে পারি। এখন থেকে আমাদের প্রতি অঙ্গ যেন ঐ এক সংকল্পের উপর একাগ্র হয়, যাতে তোমার দিব্য কর্ম উদ্‌যাপনে আমরা ক্রমে পূর্ণতরভাবে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি। (৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০)।

এর পরে শ্রীমা আর-একদিন শ্রীঅরবিন্দের জাগ্রত উপস্থিতির বিষয়ে আশ্বাসবাণী প্রদান ক'রে বলেছেন—

"বাহ্যরূপ দেখে বিভ্রান্ত হবে না—শ্রীঅরবিন্দ আমাদের ছেড়ে যাননি, তিনি এখানেই আছেন—তেমনি জীবন্ত, তেমনি সদাসন্নিহিত। এখন আমাদের কর্তব্য হবে তাঁর কর্ম সম্পন্ন করা, যেমন প্রয়োজন সমস্ত আন্তরিকতা, উৎসাহ ও একাগ্রতা দিয়ে। (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০)

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষারম্ভ

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দার্জিলিংএ আইরিশ নানদিগের স্কুলে (লরেটো কন্‌ভেণ্ট) পাঠানো হয়। তার দুই বৎসর পরে, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের সহিত উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ড গমন করেন, শ্রীঅরবিন্দের মাতাঠাকুরাণীও সঙ্গে যান। ইংলণ্ডে শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষকাল বাস করেন। তিনি প্রথমে ম্যাঞ্চেষ্টারে 'ড্রুয়েট ফ্যামিলি' নামে এক ইংরাজ-পরিবারে পালিত হন। তাঁদের প্রতি ডাঃ কে. ডি. ঘোষের এরূপ

কড়া নির্দেশ ছিল যে, ছেলেরা যেন কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে মেলামেশা না করে বা তাদের প্রভাবে না পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণ এবং মনোমোহন যখন ম্যাঞ্চেষ্টারে গ্রামার স্কুলে ভর্তি হন সেই সময় শ্রীঅরবিন্দ মিঃ ড্রুয়েট এবং তদীয় পত্নীর নিকট প্রাইভেটে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। মিঃ ড্রুয়েট লাতিন ভাষায় একজন কৃতবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে লাতিন ভাষায় এমনভাবে শিক্ষিত ক'রে তোলেন যে, শ্রীঅরবিন্দ ১৮৮৫ খ্রীঃ যখন লণ্ডনের সেণ্টপলস্ স্কুলে ভর্তি হন তখন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দকে গ্রীক ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অতি দ্রুত তাঁকে স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। ১৮৮৯ খৃঃ শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দ সেণ্টপল্স্ স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজের কিংস কলেজে ভর্তি হন এবং তথায় দুই বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। ম্যাঞ্চেষ্টারে এবং সেণ্টপল্সে শ্রীঅরবিন্দ ক্লাসিকেই (প্রাচীন ভাষাতে) অধিক মনোযোগ দেন, কিন্তু সেণ্ট পল্সে শেষ তিন বছর তিনি উক্ত বিষয়ে সেরূপভাবে সময় নষ্ট না ক'রে, স্কুলের বাইরে সাধারণ বিষয়-সমূহে জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকেন, বিশেষ ক'রে, ইংরাজি কাব্যে, সাহিত্যে নভেলে, ফরাসী সাহিত্যে এবং প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি অর্জনে তিনি তাঁর সমস্ত সময় নিয়োজিত করেন। তিনি ইতালী ও জার্মান ভাষা (এবং অল্প-অল্প স্পেন ভাষাও) শিক্ষার বিষয়ে কিছু সময় ব্যয় করেন, কবিতা রচনাতেও তিনি অনেকটা সময় দেন। এই সময়ের মধ্যে স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে তিনি খুব কম সময়ই দিতেন, কারণ স্কুলের পড়া তাঁর কাছে এত সহজ মনে হ'ত যে, তাতে সময় নষ্ট করা তিনি প্রয়োজন বোধ করতেন না। এরই মধ্যে তিনি কিংস্ কলেজে গ্রীক ও লাতিন ভাষায় সমস্ত পুরস্কারগুলি এক বৎসরের মধ্যেই অর্জন ক'রতে সমর্থ হন এবং কেম্ব্রিজের ট্রাইপস পরীক্ষায় তিনি উচ্চ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কেম্ব্রিজের এই পরীক্ষায় পাস করলে, সাধারণ নিয়মে ছাত্রদের বি-এ ডিগ্রী দেওয়া হ'য়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ মাত্র দুই বৎসরেই ট্রাইপসের প্রথম অংশের পাঠ শেষ ক'রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছিলেন, কিন্তু বি-এ ডিগ্রী পেতে হ'লে তাঁকে আরও এক বছর পরে পরীক্ষা দিতে হ'ত, অথবা তিনি যদি ডিগ্রীর জন্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাতেন তা' হ'লেও তাঁকে বি-এ ডিগ্রী দেওয়া হ'ত। কিন্তু সেজন্ত তিনি মোটেই যত্নবান হননি, কারণ ইংলণ্ডে কেবল-মাত্র শিক্ষণকার্য্যের ব্যাপারেই ডিগ্রীর মূল্য অধিক বিবেচিত হ'য়ে থাকে।

১৮৯০ সালে শ্রীঅরবিন্দ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হন; তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষায় এত অধিক নম্বর পান যে, তাতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে রেকর্ড স্থাপন করেন, তাঁর পূর্ববর্ত্তী কোনো ভারতীয় এবং ইউরোপীয় পরীক্ষার্থী উক্ত দুই ভাষায় অতো অধিক নম্বর অর্জনে সক্ষম হয়নি। ইংলণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দ রাশি-রাশি পুস্তক পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের জন্য ঘোড়ায় চড়া অভ্যাসের বিষয়ে তিনি তেমন মনোযোগী হননি এবং শেষ অশ্বারোহণ পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হন; সাধারণ নিয়মে উক্ত পরীক্ষায় পাশের জন্য তাঁকে আর-একবার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু পরীক্ষার দিন অনুপস্থিত থেকে তিনি উক্ত বিষয় এড়িয়ে যান। এই অজুহাতে শ্রীঅরবিন্দকে সিভিল সার্ভিস থেকে বাতিল করা হয়, যদিও ঐ একই ব্যাপারে আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের, পরে, ভারতে আরও সুযোগ দেওয়া হ'য়ে থাকে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য শ্রীঅরবিন্দ নিজের অন্তরে কোনও সাড়া অনুভব করেননি, তাই কোনও উপায়ে তিনি সেই বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টায় ছিলেন। সুতরাং সরাসরি সার্ভিস প্রত্যাখ্যান না ক'রে, এই উপায়ে তিনি উক্ত বিষয়ে নিজকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করলেন। কারণ তাঁর অভিভাবকেরা তাঁকে স্বেচ্ছায় সিভিল সার্ভিস প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে কিছুতেই অনুমতি দিতেন না।

এগার বৎসর বয়সে শ্রীঅরবিন্দের অন্তরে একটি বিষয়ে গভীর ছাপ ব'সে যায়; তিনি উপলব্ধি করেন যে, এমন সময় আসছে যখন সারা বিশ্বময় মনুষ্য-সমাজে এক ভীষণ আলোড়ন ও জাগরণের সৃষ্টি হবে এবং সেই জন-জাগরণে অংশ গ্রহণ করবার জন্য তাঁর নিজের জীবনও নিয়তি-নির্দিষ্ট হ'য়ে আছে। তাঁর পিতৃদেব তাঁকে যে সব চিঠিপত্র লিখতেন তাতে ভারতে বৃটেনের গতানুগতিক নীতি এবং ভারতবাসীর প্রতি তাদের হৃদয়হীন ব্যবহারের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতেন; ভারতের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশের অনাচারের বিষয়ের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে সেই-সব সংবাদপত্রও তিনি বিলাতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এই সব ব্যাপার এবং অন্যান্য ঘটনাচক্র শ্রীঅরবিন্দের মনে ভারতে বিদেশী রাজত্বের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ এবং তিক্ততা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু মাতৃভূমির মুক্তিকল্পে কার্য্যকরী কোনও প্রকার কর্মপন্থা অবলম্বনের বিষয়ে তিনি কয়েক বৎসর পরে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেমব্রিজে ভারতীয় মজলিস দলের

সভ্য থাকাকালে (পরে তিনি যার সেক্রেটারী মনোনীত হ'য়েছিলেন) তিনি বিদ্রোহমূলক অনেক বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে, এই কারণেই কর্তৃপক্ষীয়েরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে তাঁকে বাতিল করার জন্য স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর ভ্রাতাগণ সেখানে একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদল গঠন করে দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্ব এবং তাঁর মডারেট-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয়দের এক গোপন সভায় যোগদান করেন। সেই সভায় 'লোটাস এণ্ড ড্যাগার' (পদ্ম ও অসি) এই কৌতূহলপূর্ণ নামে একটি গুপ্ত সমিতি (সিক্রেট সোসাইটি) গঠিত হয়, এর অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত সমিতির প্রত্যেকটি সভ্য ভারত থেকে বিদেশী রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য যে-কোন প্রকারের কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনের বিষয়ে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমিতির বিলোপ ঘটে এবং তার সভ্যেরা আর একত্র মিলিত না হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তবে সেই সব সভ্যদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের গৃহীত শপথ পালন করে চলেন, তাঁদেরই অন্যতম হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ। মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপে যেসব বিপ্লব দেখা দেয় স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে, সেবিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন ক'রে যুবক অরবিন্দ ভারতে ফিরবার আয়োজন শুরু করলেন।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে শ্রীঅরবিন্দকে যখন বাতিল করা হয় সেই সময় বরোদার গাইকোয়াড় লণ্ডনে ছিলেন। স্যর হেন্‌রী কটনের ভ্রাতা জেমস্ কটন শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেন। শ্রীঅরবিন্দ গাইকোয়াড় কর্তৃক বরোদা ষ্টেটের কাজে নিযুক্ত হ'য়ে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড পরিত্যাগ ক'রে ভারতে ফিরে আসেন। শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্বেই তাঁর পিতৃদেব পরলোকগমন করেন। ডাঃ কে, ডি, ঘোষের মৃত্যু একটি মর্মান্তিক ঘটনা :—তিনি এরূপ ভুল সংবাদ পান যে, যে জাহাজে ক'রে শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরে আসছিলেন, সেই জাহাজডুবির ফলে শ্রীঅরবিন্দের জীবনাবসান হ'য়েছে। পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে শোকাভিভূত হ'য়ে ডাঃ কে, ডি, ঘোষ শয্যা গ্রহণ করেন এবং গভীর শোকের সহিত পুত্রের নাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে দেহত্যাগ করেন।

১৮৯৩ হ'তে ১৯০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত, ১৩ বৎসর কাল ধ'রে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ষ্টেটের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত থাকেন,—প্রথমে সেটল্‌মেন্ট ও রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে এবং মহারাজের জন্ম সেক্রেটেরিয়টের কাজে, তারপর কলেজে ইংরাজি প্রফেসরের পদে এবং সর্বশেষে ভাইস প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি কলেজের কর্ম পরিচালনা করেন। এই বৎসরগুলি ছিল শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার প্রস্তুতির বৎসর, তাঁর আত্মোৎকর্ষ লাভের এবং তাঁর সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন থাকবার অনুকূল সময়। কারণ পণ্ডিচেরী হ'তে প্রথমে তাঁর যে সব কবিতা প্রকাশিত হয় তা' রচিত হ'য়েছিল এই সময়ের মধ্যেই। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পিতৃদেবের নির্দেশক্রমে ভারতের এবং প্রাচ্যের কৃষ্টির সহিত একেবারে সম্পর্ক-বর্জ্জিত হ'য়ে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হন। বরোদায় এসে তিনি তাঁর সে অভাব পূরণ ক'রে নেন; তথায় তিনি সংস্কৃত এবং আধুনিক নানা ভাষা শিক্ষা করেন। বরোদা-রাজকার্য্যের জন্য মারাঠী এবং গুজরাটী ভাষা তাঁকে বিশেষ ক'রে শিখতে হয়। তাঁর মাতৃভাষা বাংলা, বেশীর ভাগই তিনি নিজের চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করেন। এই বৎসরগুলির শেষের দিকে অধিকাংশ সময়ই তিনি নীরবে রাজনৈতিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, কারণ প্রকাশ্যভাবে গণ-জাগরণমূলক কোনো কাজে যোগ দেওয়ার বিষয়ে বরোদা-ষ্টেটের কর্ম্ম-দায়িত্ব তাঁর পক্ষে বাধাস্বরূপ ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে তিনি সুযোগ পান বরোদার কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে প্রকাশ্যভাবে রাজ-নৈতিক কর্ম্মে ঝাঁপিয়ে পড়বার। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় এসে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা বরণ করেন।

জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনে তখন তিনি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা এবং নির্দেশকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ ক'রে চলার বিষয়ে তাঁর শান্ত-সৌম্য দেবোপম মূর্তিটিই যেন ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। শ্রীঅরবিন্দের সত্যকারের রূপটি তাঁর মানুষীরূপকে ছাপিয়ে তখন থেকেই অনেকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হ'য়েছিল। সে-যুগের দেশকর্মী এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রকুমার গুহরায় মহাশয় সে-সময় শ্রীঅর-বিন্দকে যখন প্রথম দর্শন করেন, শ্রীঅরবিন্দ তখন দেবতারূপেই তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। বরোদা ত্যাগ ক'রে কলকাতায় এসে তখন শ্রীঅরবিন্দ ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতেই বাস

করছিলেন। সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নগেনবাবু সেখানে শ্রীঅরবিন্দকে সেই প্রথম দর্শন করেন। এ-বিষয়ে নগেনবাবু তাঁর 'দেবতা-বিদায়' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"...আমি বসিতেই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'অরবিন্দ ঘোষের নাম শুনেছ?' আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জবাব দিলাম—'হাঁ, শুনেছি।' রাজা তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোককে দেখাইয়া কহিলেন। ..আমি সঙ্গে সঙ্গেই আসন হইতে উঠিয়া গিয়া অরবিন্দকে প্রণাম করিলাম। তিনি ছিলেন পাঠরত। হাতের পুস্তক হইতে নিবদ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া আমার দিকে একবার চাইলেন মাত্র। রহস্যলোকে অধিষ্ঠিত অতীন্দ্রিয় পুরুষ অকস্মাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিলে এবং সাধারণ মানবের রূপ ধরিয়া একেবারে চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলে মানুষের যেমন আনন্দের অন্ত থাকে না, এবং বিস্ময়েরও সীমা থাকে না আমার অবস্থাও তখন তদ্রূপ।

"অরবিন্দের বেশভূষায় কোনো পারিপাট্য নাই। তাঁহার কাপড় জামা জুতা সাদাসিধা রকমের। পরনে সাধারণ দেশী ধুতি, গায়ে টুইলের টেনিস্কাপ সার্ট, পায়ে চটি, সৌম্য-শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, চক্ষু দুইটি তেজোময়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। অরবিন্দ-দর্শনের সেই প্রথম দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ভাগ্য প্রসন্ন! তাই সেদিন রাজদর্শনের সঙ্গে আমার দেবতা-দর্শনও মিলিল।"

রাজনৈতিক কার্য্যক্রম

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কার্য্যক্রমের তিনটি দিক ছিল। প্রথমটি হচ্ছে :—গোপনে বিদ্রোহমূলক কার্য্য দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ক'রে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য জাতিকে প্রস্তুত ক'রে তোলা, দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল :—নানাভাবে প্রচারাদির দ্বারা দেশের সমগ্র জনসাধারণকে স্বাধীনতালাভের জন্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা। কিন্তু যখন তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রেছিলেন তখন ভারতের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ্ কর্তৃক তাঁর এই পরিকল্পনা অস্বাভাবিক, অসম্ভব, এমন-কি পাগলের খেয়াল ব'লে বিবেচিত হ'য়েছিল। তাঁদের ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অত্যধিক শক্তিশালী আর তার তুলনায় ভারত খুবই দুর্ব্বল এবং বস্তুতঃ অস্ত্রহীন। এমন অবস্থায় তাঁরা এরূপ প্রচেষ্টায় সাফল্যের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে অক্ষম। শ্রীঅরবিন্দের তৃতীয় পরিকল্পনা ছিল—তিনি চেয়েছিলেন : ঐক্যবদ্ধ জনসঙ্ঘ

গঠন ক'রে ক্রমবর্দ্ধমান অসহযোগ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা বিদেশী শাসন-ব্যবস্থাকে একেবারে অচল ক'রে তুলতে।

তৎকালে বৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যশক্তি এবং তার প্রয়োগ-ব্যবস্থা আধুনিককালের মতো বিপুল এবং পর্য্যাপ্ত ছিল না, এবং তা অপ্রতিরোধ্যও ছিল না। রাইফেল-অস্ত্র তখনও পরীক্ষাধীন ছিল ; বিমানশক্তিও বর্দ্ধিত সংখ্যায় পরিণত হয়নি এবং কামানশক্তি পরবর্তীকালের ন্যায় মহাধ্বংসী ছিল না। ভারতবাসী অস্ত্রহীন ছিল সত্য, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ভেবে দেখেছিলেন যে, উপযুক্ত সংগঠন এবং বহিঃশক্তির সাহায্যের দ্বারা সে অভাব পূরণ হ'য়ে যাবে, এবং ভারতের ন্যায় বিরাট দেশে ব্রিটিশের অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত সংঘবদ্ধ বিদ্রোহী ভারত-সন্তানের গেরিলা যুদ্ধও কৃতকার্য্য হবে ; ভারতীয় সেনাবিভাগেও মহা বিদ্রোহ দেখা দিবার সম্ভাবনা ছিল। সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ব্রিটিশজাতির মনোভাব এবং তাদের বৈশিষ্ট্যও অনুধাবন ক'রেছিলেন। স্বাধীনতালাভের জন্য ভারতবাসী যদি কোনো আন্দোলন শুরু করে তবে তারা বাধা প্রদান করবে সত্য, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধীরে-ধীরে ভারতের এরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে তারা বিরোধী হবে না যা তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার বিষয়ে পরিপন্থী হয়। তারা যদি দেখে যে, ভারতের বিদ্রোহ এবং প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা ব্যাপক এবং স্থায়ীরূপ ধারণ করছে, তবে তারা তাদের সাম্রাজ্যের পক্ষে, যতটা পারে সুযোগ-সুবিধা রেখে একটা-কোনো চুক্তিতে রাজী হবে অথবা, অবস্থা চরম বুঝলে, ভারতবাসীকে জোর-পূর্বক তাদের হাত থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিতে না দিয়ে, তারা সম্মতিক্রমে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করবে। এতেই বোঝা যায়, কী গভীর এবং অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দের ছিল।

কারো কারো এরকম ধারণা আছে যে, সম্পূর্ণরূপে শান্তির নীতিকে অবলম্বন ক'রেই শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ ব'লে, তিনি হিংসামূলক সকল প্রকার নীতি ও কার্য্যকলাপের বিরোধী ছিলেন, এবং টেররিজম্ (সন্ত্রাসবাদ) ইত্যাদি সমর্থন করতেন না। তাঁর সম্বন্ধে এ-ও বলা হ'য়েছে যে, তিনি অহিংসবাণী প্রচারের অগ্রদূত ছিলেন। কিন্তু এসব কথা সম্পূর্ণ ভুল। শ্রীঅরবিন্দ অক্ষম নীতিবিদ্ এবং দুর্বল শান্তিবাদী, এই দু'টির কোনোটিই ছিলেন না। কারণ গীতায় বর্ণিত কর্মযোগের প্রকৃত শিক্ষানুযায়ী তিনি নিজকে সম্পূর্ণভাবে গঠন ক'রে তুলেছিলেন, অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের আদেশে 'ঘোর' কর্মকেও হাসিমুখে এবং

নির্লিপ্তভাবে বরণ ক'রে নেবার জন্য তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। গীতার নিম্নোক্ত এই শ্লোকটির অর্থ তার সত্যকারের রূপে তাঁর কাছে প্রকট হ'য়েছিল—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে (প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স) শ্রীঅরবিন্দ তৎকালীন অবস্থায় একটি উত্তম নীতি-কৌশল হিসাবেই গ্রহণ ক'রেছিলেন, অহিংসা বা শান্তির আদর্শের জন্য নয়। শান্তি হ'চ্ছে উচ্চতম আদর্শের একটা দিক, কিন্তু মূলতঃ তা মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক হওয়া প্রয়োজন, মানব-স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হ'লে এ বস্তু সর্ব্বতোভাবে লাভ করা যায় না। নৈতিক আদর্শ বা অহিংস-নীতির উপর ভিত্তি ক'রে একে অর্জন করবার চেষ্টা করলে এর পতন অবশ্যম্ভাবী, এমন কি তাতে অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর খারাপ হবারই সম্ভাবনা যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মহাত্মাজীর অহিংস-নীতিতে। অহিংসাকে তিনি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ ক'রেছিলেন, তাই সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পাত্রে তিনি অহিংসাকেই তাঁর মুখ্য নীতি হিসাবে পালন ক'রে চ'লেছিলেন। নৈতিক আদর্শ হ'চ্ছে মনোভূমিরই উচ্চ আদর্শ। মনোভূমির ঊর্দ্ধে অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে স্থিতিলাভ না হ'লে বস্তুর এবং ঘটনাবলীর প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। আমাদের কর্ণধারের চেতনা উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রতি একান্তভাবে নিবদ্ধ থাকায় দেশ-পরিচালন ব্যাপারে ঘটনাবলীর এবং শক্তি-বর্গের প্রকৃত স্বরূপ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। তাই তাঁকে বারবার ব'লতে শোনা গেছে—"আমি বিরাট ভুল ক'রে বসেছি" (হিমালয়ান ব্লাণ্ডার)। তাঁর সেই পর্ব্বতপ্রমাণ ভুলের জন্যই আজ ভারত মাতার দেহ দ্বিখণ্ডিত হ'য়েছে, শান্তিবারির স্থলে অশান্তির আগুন দেশময় ছড়িয়ে প'ড়েছে। কারণ ভারতের একটি বিশেষ দলকে অবলম্বন ক'রে যে প্রগতি-বিরোধী শক্তি ভারতের বুকে মহা অনর্থ ঘটালো সে-শক্তির স্বরূপ অবধারণ করা আমাদের নেতার শিশু-সরল বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তিনি সেই বিরোধী শক্তির প্রধান

নায়ককে সমানভাবেই আলিঙ্গন দিয়ে চ'লেছিলেন আর বিরুদ্ধ শক্তি তাঁর সেই উদারতা এবং সরলতাকে পুরামাত্রায় নিজ স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়ে, তার শক্তিকে বহুগুণিত ক'রে তুলেছিল এবং দফার পর দফা তার চাহিদা বাড়িয়ে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছিল যেখানে তার অন্যায় আব্দারকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের নেতৃবর্গের পক্ষে আর গত্যন্তর ছিলনা—যদিও প্রকৃত পক্ষে তাঁরা তা চাননি। মহাত্মাজীর ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্বশালী, দৃঢ়চেতা এবং দরদী-হৃদয় পুরুষ সাত্ত্বিক মায়ায় এমনভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন যে, অপরিবর্ত্তনশীল, বিরোধী অশুভ শক্তিকেও তিনি বরাবর কৃপা প্রদর্শন ক'রে চ'লেছিলেন। প্রগতি-বিরোধী অশুভ শক্তির প্রতি এইরূপ কৃপার মনোভাবকে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অনার্য-জনোচিত, স্বর্গগতিরোধক এবং অযশস্কর ব'লেছেন—অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যম কীর্ত্তিকরমর্জুন। আমাদের দেশনেতা যদি সাত্ত্বিক মায়ার মোহমুক্ত হ'য়ে অর্জুনের ন্যায় 'নষ্টো মোহঃ··· স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব' এই কথা ব'লে, প্রগতি-বিরোধী শক্তিকে কৃপা না ক'রে তার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বন ক'রতেন, ভারতমুক্তির সাধনায় তার সহযোগিতার আশা ছেড়ে দিয়ে 'একলা চল্‌রে, একলা চল' এই গান গেয়ে সত্যের পতাকা বহন ক'রে চলবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তেন তবে বিরোধী শক্তি মোটেই আস্কারা পেতনা এবং এত প্রবল হ'য়ে ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের জীবনে আজ এ অনর্থ ঘটাতে পারতো না। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে 'নষ্টোমোহঃ' হ'য়ে অধ্যাত্মদৃষ্টিলাভ ঘটলো না, তাই শেষ জীবনে বড় দুঃখে তাঁকে ব'লতে হ'য়েছিল : এই অন্ধকারের মধ্যে তিনি আর বেঁচে থাকতে চাননা। কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তির জীবনে অন্ধকার ব'লে আর কোন বস্তু থাকেনা, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ হয় : আলোক হ'তে আরও উজ্জ্বল আলোকের পানে।

ভারতের রাজনীতি, তার সমাজ-ব্যবস্থা চিরদিনই পরিচালিত হ'য়ে এসেছে দেশের সত্যদ্রষ্টা ঋষি এবং অবতার পুরুষদের অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রেরণায় এবং নির্দেশে। শ্রীরামচন্দ্রের এবং শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতি লক্ষ্য ক'রলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাজনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো একটি বিশেষ নীতিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকেননি ; প্রগতি-বিরোধী শক্তির ধ্বংস সাধনের জন্য অধ্যাত্মদৃষ্টির সাহায্যে তাঁরা সর্বাবস্থায় তাঁদের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ক'রে চ'লেছিলেন সব নৈতিক বিধানকে উপেক্ষা ক'রে। শিবাজীর বীর্য্য এবং কর্মকে প্রেরণা যুগিয়েছিল গুরু রামদাসের অধ্যাত্মশক্তি। সেই রামদাস

এবং শিবাজীর যুগ্মশক্তি শ্রীঅরবিন্দ আধারে যুগপৎ আবির্ভূত হ'য়ে ভারতের নব জাগরণে এনে দিয়েছিল নবীন প্রেরণা ও শক্তি। এইরূপ যুগ্ম শক্তির আবির্ভাব যে ভারতের উত্থানের জন্য প্রয়োজন তা' উপলব্ধি ক'রে শ্রীঅরবিন্দ ব'লেছিলেন—"ভারত উঠিতেছে, কিন্তু ভারতের ভিতর দিয়া প্রাচ্যের জন্ম হইবে। তাই রাষ্ট্রীয় নেতার পশ্চাতে দাঁড়াইবে বা তাহারই মধ্যে আবির্ভূত হইবে সিদ্ধযোগী।—একই আধারে শিবাজীর সহিত রামদাসকেও জন্ম লইতে হইবে।" তাই 'দুর্গাস্তোত্রে' শ্রীঅরবিন্দের প্রার্থনায় ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল—"জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান ··যন্ত্র তব, অশুভ-বিনাশী তরবারি তব, অজ্ঞান-বিনাশী, প্রদীপ তব আমরা হইব ··যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভহন্ত্রী হইয়া তরবারি ঘুরাও, জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও।"

শ্রীঅরবিন্দকে, দেশের স্বাধীনতা অর্জন বিষয়ে কোনো-একটি বিশেষ নীতিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে দেখা যায়নি, অন্তরের সত্যের নির্দেশে তিনি তাঁর অনুসৃত নীতি পরিবর্তনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন ; সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এমন-কি, 'প্যাসিভ রেজিসট্যান্স'কেও তিনি সীমাবদ্ধ ক'রে গেছেন, তাই তিনি ব'লেছেন—

"নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধেরও একটা সীমা আছে। শাসকের শাসন-ব্যবস্থা যতক্ষণ শান্তিপূর্ণ এবং যুদ্ধনীতির নিয়মের অন্তর্ভুক্ত থাকবে ততক্ষণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী তার নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব ঠিক মতো বজায় রেখে চলবে, কিন্তু তার বাইরে এক মুহূর্তও সে সেরূপ মনোভাব নিয়ে চলতে বাধ্য নয়। আইন-বিরুদ্ধ অথবা অত্যাচারপূর্ণ নিগ্রহ-নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করা, খুন জখম এবং বর্বরতাকে আইনানুগ নীতি হিসাবে মেনে নেওয়া হ'চ্ছে ভীরুতার এবং জাতীয় মানবত্বকে খর্বিত করার অপরাধ, আমাদের অন্তরে এবং আমাদের মাতৃভূমিতে বিরাজমান দেবত্বের প্রতি পাপাচরণ। যে-মুহূর্তে এই ধরণের নিগ্রহ আরম্ভ হবে সেই মুহূর্তেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতিও হবে শেষ এবং সক্রিয় প্রতিরোধ হবে তখন ধর্ম। শাসক-গোষ্ঠীর লোকেরা যদি উপস্থিত ব্যক্তিদের মাথা ভেঙে দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রতে চায়, তবে তখন আমরা শুধু আত্মরক্ষার জন্যই আমাদের মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করবো না, আমরা ভীষণ প্রতি-আক্রমণ দ্বারা আততায়ীর মাথাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিব।" (ডকট্রিন অব প্যাসিভ রেজিসট্যান্স)।

এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-নীতিকে অবলম্বন ক'রে পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে দেশে আন্দোলন শুরু করা হ'য়েছিল, কিন্তু তাকে একান্তভাবে অহিংসনীতির নিগড়ে বেঁধে দেওয়ায় জাতির শক্তি অনেকাংশে খণ্ডিত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে জাতির সে জাগ্রতশক্তি অহিংস নীতিকে ঠেলে ফেলে অন্য পথে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সকে শক্তিশালী ক'রে তুলবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বজ্রবাণীতে ঘোষণা ক'রেছিলেন—

"নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-নীতি যদি পৌরুষব্যঞ্জক না হয় তবে তার দ্বারা কখনো শক্তিমান এবং মহৎ জাতি গ'ড়ে তোলা যায় না। আমরা নারী মনোভাবের জাতি গড়ে তুলতে চাই না, যারা শুধু নিগৃহীত হতেই জানে. আঘাত করতে জানে না।"

কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা এটা লক্ষ্য ক'রেছি যে, যে-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশ দিয়েছেন: শান্ত জনতার মস্তকে আঘাতকারী অত্যাচারীদের উপর প্রতি-আক্রমণ দ্বারা তাদের মাথাকেও ভেঙে দিতে, সে-ক্ষেত্রে মহাত্মাজী বলেছেন: "আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে গভর্ণমেণ্টকে আমাদের ভাঙা-মাথা উপহার দিব।" এমন-কি তিনি তাঁর অহিংসনীতির মোহে পিশাচ-প্রকৃতির অত্যাচারী নরাধম ব্যক্তিকেও হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল "নিজেকে হত্যা এবং আততায়ীকে হত্যা, এই দুটীর মধ্যে কোন্‌টি আপনি উপদেশ দেন?" তিনি তখন স্পষ্ট ব'লেছিলেন—"নিজেকে হত্যা করবে, আততায়ীকে হত্যা করবে না।" তার মানে আত্মহত্যা করা। হত্যা করাটাই যদি হিংসা হয় আর হত্যা না করলেই যদি অহিংসা পালন করা হয়, তবে 'নিজের দেহটাকেই বা কোন্‌ নীতিতে হত্যা করা যায়? কারণ সব দেহই ভগবানের সৃষ্টি, সুতরাং যে দেহটাকে আমরা নিজের বলি সেটাকে হত্যা করাওতো তাঁর অহিংসানীতির বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এই ধরণের অহিংসা-নীতিকে মেনে, পিশাচ-প্রকৃতির আততায়ীদের উচ্ছেদ সাধন না করে আমরা যদি আত্মহত্যাই করে চলি তবে তার ফল যে কী দাঁড়াবে তা একটি অল্পবয়স্ক শিশুও বুঝতে পারে, তাহলে এই পৃথিবীতে তাঁর স্বপ্নের রামরাজ্য কোন দিনই প্রতিষ্ঠিত হবেনা, দুষ্কৃতকারী পিশাচেরাই চিরকাল রাজত্ব করবে। দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন না করলে যে

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ভগবান স্বয়ং তা উপলব্ধি করেছেন, তাই না তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

সুতরাং ঐ ধরণের অহিংসা-পালন যে ভগবদিচ্ছা বিরোধী তা সহজেই বুঝা যায় ।

দুর্নীতিপরায়ণ অত্যাচারী এবং প্রগতি-বিরোধী শক্তির প্রতি দেশনেতার কৃপা এবং সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব ও আচরণের ফলেই সেই বিরোধীশক্তি ভারতে এত প্রবল হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল। ব্রিটিশশক্তি ভারতকে তার পদানত করে রেখেছিল সত্য, কিন্তু ব্রিটিশশক্তি মানব-প্রগতি-বিরোধী শক্তি নয়, সে সত্য শ্রীঅরবিন্দ ভালভাবেই বুঝেছিলেন। ভারতে প্রগতি-বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান যে ভারতবাসীর এক অংশকে অবলম্বন ক'রে হতে পারে, শ্রীঅরবিন্দের সে-ভবিষ্যদ্দর্শন বাংলাদেশে থাকাকালেই হ'য়েছিল। তাই, মুসলিম লীগ যখন বাংলা-দেশে হিন্দু-নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করে তখন তিনি পাণ্ডিচেরীতে তাঁর এক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন—

"বাংলার অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ; সেখানকার হিন্দুদের অবস্থা ভয়াবহ, এমন কি অবস্থা আরও বেশী ভয়াবহ হ'তে পারে দিল্লীতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সাময়িক পরিণয়-বিধান সত্ত্বেও। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যেন মাত্রা ছাড়িয়ে দেখা না দেয় এবং আমরা/যেন একেবারে হতাশ হ'য়ে না পড়ি। বাংলাদেশে অন্ততঃ পক্ষে দু'কোটী হিন্দুও থাকবে যারা কোনোরূপেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। এমন কি হিটলারও ধ্বংস-সাধনের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেও ইহুদীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়নি, তারা এখনও যথেষ্ট প্রাণবন্ত আছে। আর হিন্দু কৃষ্টি এবং সভ্যতার কথা বলতে গেলে তা' এমন দুর্ব্বল এবং হাল্কা জিনিষ নয় যে, অতি সহজেই একে মুছে ফেলা যেতে পারে; এ-বস্তু কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর ধরে অস্তিত্ববান আছে এবং আরও অধিককাল ধ'রে স্থায়ী থাকবার জন্য এবং বিপদ কাটিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবার জন্য যথেষ্ট শক্তি অর্জন ক'রেছে। যা ঘটছে তা আমার কাছে মোটেই আশ্চর্য্যরূপে দেখা দেয়নি। এ-ব্যাপার যে ঘটবে তা আমি বাংলায় থাকার সময়ে আগে থেকেই জানতে পেরেছিলাম এবং সে-বিষয়ে দেশের লোকদের সাবধান হতে বলেছিলাম যে, এরকম কাণ্ড ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা

রয়েছে, এমন কি, প্রায় তা অবশ্যম্ভাবীও হতে পারে। সুতরাং সেজন্য তাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার। কিন্তু সে সময়ে আমার কথার কেউ কোনো মূল্যই দেয়নি, যদিও পরে যখন বিপদ প্রথম দেখা দিয়েছিল তখন কেউ কেউ আমার কথা স্মরণ করেছিল এবং স্বীকারও করেছিল যে, আমি তখন ঠিকই বলেছিলাম। একমাত্র সি, আর,দাসের মনে এ বিষয়ে গভীর আশঙ্কা ছিল, এবং যখন সে পণ্ডিচেরী এসেছিল তখন আমাকে বলেছিল যে, যতক্ষণ না এই সঙ্কটজনক সমস্যার সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ সে চায় না যে, ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু এই সব ঘটনার জন্য আমি মোটেই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়িনি, কারণ আমি জানি এবং বহুবার আমার এ-অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, গভীরতম অন্ধকারের পারে রয়েছে ভগবানের বিজয়-আলোক—যে ব্যক্তি ভগবানের হাতের যন্ত্র তারই জন্য। আমি জাগতিক ব্যাপারে যে-বিষয়েই দৃঢ় এবং একান্ত সংকল্প করেছি তার সংঘটনের জন্য, বিলম্বিতভাবে, পরাজয় এবং বিপদের মধ্য দিয়েও তা সংঘটিত হয়েছে। এমন সময়ও এসেছিল যখন হিটলার সর্বত্রই বিজয় অর্জন করে চলেছিল, এবং এরূপ প্রতীয়মান হয়েছিল যে, অসুরশক্তির কালো বোঝা সারা জগতের বুকে চেপে বসবে। কিন্তু আজ হিটলার কোথায় এবং কোথায় তার রাজত্ব? অপর যেসব অশুভশক্তি তাদের ছায়া বিস্তার করতে চাইছে, মানব সভ্যতাকে গ্রাস করতে চাইছে, তারাও নিঃশেষ হবে, যেমন নিঃশেষ হয়েছে হিটলার।"

বাংলাদেশে বিপ্লব-প্রচার

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এরূপ অভিমত কখনও গোপন রাখেননি যে, যদি অপর কোনও পন্থায় স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব না হয়, এবং জাতি যদি প্রস্তুত থাকে তবে প্রয়োজন হলে শক্তি-প্রয়োগ দ্বারাই সে তার দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করবে। দেশ সেরূপ পন্থা অবলম্বন করবে কিনা তা নির্ভর করছে দেশের পক্ষে কোন্ নীতি সর্বাপেক্ষা উত্তম তা নির্ণয়ের উপর, কোনো প্রকার নৈতিক বিচার-বিবেচনার উপর নয়। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের কর্ম এবং নীতি লোকমান্য তিলকের এবং অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের কর্মনীতির সহিত এক ছিল, যাঁরা কোনো মতেই শান্তিবাদী বা অহিংসার উপাসক ছিলেন না।

ভারতে ফিরে শ্রীঅরবিন্দ কেবলমাত্র 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রেই কয়েক বছর রাজনৈতিক কর্মে হস্তক্ষেপের বিষয়ে ক্ষান্ত

ছিলেন। কিভাবে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে তাই স্থির করবার জন্য তিনি দেশের অবস্থা ভালভাবে বুঝে নিচ্ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কাজে প্রথম হস্তক্ষেপ করলেন বিবেকানন্দের দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই, বিবেকানন্দের স্বপ্নকে রূপায়িত ক'রে তোলবার জন্য। তিনি বরোদা সেনা-বিভাগের যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর লেফট্যানান্ট হিসাবে ঐ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলায় পাঠালেন, দেশকে তৈরী ক'রে তুলবার একটি সুপরিকল্পিত কর্মতালিকা স্থির ক'রে, যার ফললাভ, তিনি ভেবেছিলেন, ৩০ বৎসরের মধ্যে সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই ঈপ্সিত ফল লাভ ক'রতে জাতির ৫০ বছর লেগেছে। এই যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের সহায়তায় বরোদা ষ্টেটের সৈন্য-বিভাগে, তাঁর বাঙালী নামের পরিবর্তন ক'রে 'যতীন্দর উপাধ্যায়' নামে সেনাদলে ভর্তি হ'য়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শে। যতীন ব্যানার্জী শ্রীঅরবিন্দ-পরিকল্পিত কর্মসূচী নিয়ে যখন বাংলায় এলেন তখন সে-যুগের বিপ্লবী কর্মী অবিনাশ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর প্রেরণায় বাংলার প্রথম কর্মীরূপে বিপ্লব প্রচারের কাজে ভর্তি হন এবং বারীন্দ্রকুমারের উৎসাহে দেশোদ্ধারের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা এই ছিল যে, সমগ্র বাংলাদেশে গোপনে এবং যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে, নানা ছলে এবং আবরণে বিপ্লব প্রচার করা ও লোক সংগ্রহ করা এবং সে-কাজ ক'রতে হবে দেশের যুবা-সম্প্রদায়ের মধ্যে আর সেই সঙ্গে দেশের আগ্রহশীল প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে অর্থ-সাহায্য এবং অপর যে-কোনো সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা করতে হবে। বিদ্রোহ প্রচারের জন্য কেন্দ্র স্থাপিত হবে প্রতিটি সহরে এবং ঘটনাক্রমে প্রত্যেক গ্রামে। সংস্কৃতি, নৈতিক শিক্ষা এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে যুবা-সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হবে, এবং দেশে যে সব যুবসঙ্ঘ আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলিকে বিপ্লবের কাজে লাগাবার জন্য আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে। যুবকগণকে কার্যত: এরূপভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে—অশ্বারোহণে, ব্যায়ামে, নানা রকমের খেলাধূলায়, ড্রিল এবং সংঘবদ্ধ কুচকাওয়াজ ইত্যাদি বিষয়ে—যাতে তারা শেষ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগের সময় কাজে আসতে পারে। বাংলাদেশে শ্রীঅরবিন্দের উক্ত পরিকল্পনার বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলন্ত ফল দেখা দিল। আগে থেকে যেসব ক্ষুদ্র সংঘ এবং যুবসমিতি প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাদের তখনও কোনো সুস্পষ্ট সংকল্প বা বিপ্লব বিষয়ে স্থির কোনো কর্মতালিকা ছিল না তারা

এই দিকে ফিরতে আরম্ভ করলো এবং যে সামান্য কতিপয় ব্যক্তির বৈপ্লবিক লক্ষ্য ছিল তারাও এর সঙ্গে যোগস্থাপন করলো এবং অতি দ্রুত সংঘবদ্ধভাবে দেশের কর্মক্ষেত্র বাড়িয়ে তুললো; দেখতে দেখতে স্বল্প সংখ্যা পরিণত হল বিরাট আকারে।

এর পরে এল বঙ্গভঙ্গ, সর্বসাধারণের মধ্যে দেখা দিল বিপ্লব। দেশের এই অবস্থা চরমপন্থীদের উত্থান এবং জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে পরম সহায়স্বরূপ হল। শ্রীঅরবিন্দের কার্যকলাপ ক্রমশঃ অধিকতররূপে মোড় নিল এই দিকে; ভবিষ্যতে প্রচণ্ডভাবে বিপ্লব আন্দোলন চালাবার জন্য তিনি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করলেন।

শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় দেশকর্মীদের লিখে পাঠালেন—"এইবার মহা সুযোগ উপস্থিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিশেষভাবে জোর দাও। এই আন্দোলনের ভিতর থেকে অনেক কর্মী পাবে।" তিনি No Compromise নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখে পাঠালেন। কিন্তু কোনো প্রেসই সেটা ছাপতে চাইলো না। অগত্যা অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-প্রমুখ কর্মীরা তাঁদের ঘরে টাইপ, ষ্টিক, লেড্ এবং কেস ইত্যাদি কম্পোজিং-এর সাজ সরঞ্জাম কিনে এনে কুলকার্নী নামে একটি মারাঠী যুবককে দিয়ে সেই পুস্তিকা কম্পোজ করালেন। এই মারাঠী যুবকটি অবিদাদের সঙ্গেই থাকতেন। কম্পোজ করানোর পর সেই পুস্তিকা রাতারাতি একটা প্রেসে ছাপিয়ে নেওয়া হয় এবং সমস্ত সংবাদপত্র-সম্পাদক ও গণ্য মান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতরে তা বিলি করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে বারীনদা আর অবিদা সেই পুস্তিকা নিয়ে যান। সুরেনবাবু প্রথমে ওটা তাঁদের রেখে যেতে বলেন, কিন্তু তাঁরা উভয়ে নাছোড়বান্দা হ'য়ে পড়ায় তিনি সেই পুস্তিকার দিকে একবার নজর দিতেই আর ফেলে রাখতে পারলেন না,—একমনে সমস্তটা প'ড়ে নিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন এবং সেই পুস্তিকার লেখক কে তা' জানতে চাইলেন। কারণ, তিনি মন্তব্য করলেন যে, কোনো ভারতবাসী এমন-কি কোনো বাঙ্গালীরও পক্ষে এরকম ইংরাজী লেখা এবং এরূপ যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। যখন তিনি শুনলেন যে, অরবিন্দ ঘোষ এর লেখক তখন বল্লেন—"হাঁ, একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কারও পক্ষে এরকম লেখা সম্ভব ছিল না।"

বারীন্দ্রের পরামর্শে শ্রীঅরবিন্দ 'যুগান্তর' নামে সংবাদপত্র প্রকাশের বিষয়ে সম্মত হলেন; ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে যুগান্তর বার হয়। যুগান্তরের

মূল উদ্দেশ্য হয়েছিল প্রকাশ্যভাবে বিপ্লব প্রচার করা এবং ব্রিটিশ রাজত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং উক্ত পত্রিকার গোড়ার সংখ্যাগুলিতে কতিপয় উদ্বোধনী প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন এবং পত্রিকার পরিচালন-ব্যবস্থা সর্বদাই তিনি নিজের আয়ত্তে রেখেছিলেন। যুগান্তর অফিসে একবার খানাতল্লাসীর সময় সহকারী সম্পাদক-গোষ্ঠীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় স্বেচ্ছায় নিজেকে পত্রিকার এডিটররূপে পরিচয় দিয়ে পুলিসে গ্রেপ্তার হন। তখন শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশক্রমে 'যুগান্তর' ব্রিটিশ-কোর্টে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার নীতি বর্জন করে। এর দ্বারা ব্রিটিশকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁরা বিদেশী সরকারকে স্বীকার করেন না। তার ফলে দেশে গভীরভাবে পত্রিকার সম্মান এবং প্রভাব বৃদ্ধি হয়। এই পত্রিকায় কমপক্ষে তিনজন অল্প বয়স্ক শক্তিশালী এবং কৃতী সম্পাদক ও লেখক ছিলেন, এবং পত্রিকাটি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে। একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, গুপ্তচক্র (সিক্রেট সোসাইটি) সন্ত্রাসবাদকে (টেররিজম) তাঁদের কর্ম্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেনি, কিন্তু ব্রিটিশের অন্যায় দমননীতির ফলেই বাংলাদেশে তার আবির্ভাব হয়।

বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্যে দিয়েই শ্রীঅরবিন্দ প্রথমতঃ দেশের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁর কেমব্রিজের বন্ধু কে, জি, দেশপাণ্ডের অনুরোধে তিনি উক্ত পত্রিকায় 'নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড' (পুরাতন দীপ স্থলে নূতন প্রদীপ) শিরোনামায় তাঁর সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি যে, সেই প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন মূলক নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং নির্ভীকভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ মূলক সক্রিয় নেতৃত্বের জন্য জাতিকে আহ্বান করেন। কিন্তু সেই স্পষ্টবাদী এবং অখণ্ডনীয় সমালোচনা-প্রকাশ একজন মডারেট নেতা (রাণাডে) পত্রিকার সম্পাদককে ভয় দেখিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়ার ফলে উক্ত পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হ'তে পারেনি। অতঃপর শ্রীঅরবিন্দকে এ-বিষয় হ'তে স'রে দাঁড়াতে হয়। তিনি এরূপ প্রয়োজন বোধ করেন যে, কংগ্রেসের কার্য-কলাপকে বুর্জুয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডীর বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করা দরকার। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ ঐ ধরণের সব রকম কাজ বন্ধ ক'রে দেন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি

গোপনে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি তিলকের সঙ্গে যোগস্থাপন ক'রেছিলেন, এবং তিনি এটা বুঝেছিলেন যে তিলকই বিপ্লবী সংঘ পরিচালনের নেতা হবার যোগ্য পাত্র। আমেদাবাদ কংগ্রেসে শ্রীঅরবিন্দ তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেখানে তিলক শ্রীঅরবিন্দকে সভা মণ্ডপের বাইরে নিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাকাল যাবৎ আলোচনায় তিনি শ্রীঅরবিন্দের পরিবর্তনমূলক বিপ্লব-আন্দোলনের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং মহারাষ্ট্রে তাঁর নিজের কার্যবিধির বিষয়েও শ্রীঅররিন্দকে বুঝিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিপ্লব কার্যের সুবিধার জন্য একই ধরণের কর্ম-নীতিকে গ্রহণ ক'রেছিলেন যা পররর্তী কালে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ কর্তৃক দেশের সাধারণ কর্মতালিকার একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে গৃহীত হ'য়েছিল। দেশে আদর্শ প্রচারের কেন্দ্রসমূহে তিনি যুবকগণকে স্বদেশী প্রচারের জন্য যথো উৎসাহিত ক'রেছিলেন, যে-পরিকল্পনা দেশে তখনও শৈশব অবস্থাতেই ছিল বাংলাদেশে বিপ্লবীদলের যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সখারাম গণে দেউস্কর নামে একজন মারাঠী যুবক, যাঁর পরিবারবর্গ বহুকাল হ'তেই বাংলা দেশের অধিবাসী (ডোমিসাইল) ছিলেন। সখারাম দেউস্কর বাংলা ভাষা একজন কৃতী লেখক ছিলেন। তিনি বংলাভাষায় শিবাজীর একটি জনপ্রি জীবনী প্রকাশ করেন। সে পুস্তকে তিনি সর্বপ্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহা করেন যা পরবর্তীকালে ন্যাশন্যা লিষ্টদল কর্তৃক দেশের স্বাধীনতার বাক্য হিসাবে গৃহীত হয়। জাতীয়তাবাদীদের চতুবর্গ কর্ম-তালিকার মধ্যে একটি বিষয় ছি 'স্বরাজ'। সখারাম দেউস্কর 'দেশের কথা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে তাতে তিনি দেশের শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে ব্রিটিশের অত্যাচা এবং শোষণ-নীতির বিষয়ে বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। সেই পুস্ত প্রকাশের ফলে বাংলাদেশে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তার আদর্শ বঙ্গী যুবকদের মনকে বিশেষভাবে অধিকার করে, স্বদেশী আন্দোলনের জন্য জাতিকে গড়ে তুলতে অপর যে-কোন বস্তু অপেক্ষা অধিক সহায়তা করে। শ্রীঅরবিন্দ নিজে বিদেশের অর্থনৈতিক যোঁয়ালকে ঝাঁকা দিয়ে কোন স্বদেশী শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য গঠনের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখেছিলেন এবং বিপ্লব-প্রচেষ্টার কাজে তাকে একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বরোদা ষ্টেটের কাজে লিপ্ত থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতি কর্মে যোগ দিতে পারেননি। চেয়েছিলেন প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে তিনি নিজের না জাহির না ক'রে, আন্দোলনের পিছনে থেকে জাতিকে লক্ষ্য পথে পরিচালি

রতে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নাতিই শ্রীঅরবিন্দকে সাধারণে প্রকাশ ক'রে য়; 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রী করায় তাঁর প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

'বন্দে মাতরমে' গভর্ণমেণ্টকে আক্রমণ ক'রে স্পষ্ট এবং জ্বালাময়ী ভাষায় বন্ধাদি প্রকাশের জন্য শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে যখন কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি াওয়া গেল না তখন 'যুগান্তরে' প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রবন্ধের কিয়দংশের নুবাদ 'বন্দেমাতরমে' প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট আইনে অভিযুক্ত করেন। শ্রীঅরবিন্দের সেই প্রসিকিউশানের যাপারে বিপিন পালকে প্রধান সাক্ষী মানা হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে েই অভিযোগ পণ্ড হ'য়ে যায় গভর্ণমেণ্ট তাঁকে 'বন্দে মাতরমে'র সম্পাদকরূপে মাণ করতে পারেননি ব'লে। এটা বিশেষ ক'রে সম্ভব হ'য়েছিল বিপিন াল শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায়। বিপিন পাল হাশয়ের সেই দুঃসাহসিক প্রত্যাখ্যানের জন্য তাঁর মতো উচ্চ হৃদয় েশপ্রেমিককে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হয়। বিপিন পালের সেই ারাবরণকে অভিনন্দন জানিয়ে তখন 'বন্দেমাতরমে' লেখা হ'য়েছিল :

"A great orator and writer, this spokesman and prophet of lationalism has risen ten times as high as he was before in e estimation of his countrymen......Nationalism has already ecome the stronger for his self-immolation."

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ না টিকলেও শুধু তাঁকে আইনে ভিযুক্ত করার জন্যই তখন দেশময় একটা প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছিল; েশের সমস্ত জাতীয়তাবাদী কাগজেই শ্রীঅরবিন্দের নবজাগরণমূলক নির্ভীক াণী প্রচারের বীরোচিত সাহসকে এবং দেশের জন্য সুমহান্ ত্যাগকে ভিনন্দিত ক'রে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হ'য়েছিল—

ndian Patriot লিখেছিলেন—

"At this moment millions of his countrymen are doing omage to his genious. They are pronouncing his name ith reverence and gratitude. They honour him, because he onours them... For his country's sake, he counts every ıffering a gain. He has dedicated his life to the uplifting of ation......If the greatness of an individual is to be judged y the richness of the sacrifice made in the cause of freedom d truth, Mr. Ghose is great indeed. Gold and power may

not be his. But thy labour is not lost. Thy courage wil live to inspire the race. Thou shalt live not only in marbl and gold but in poet's song which is more enduring. Thou art splendid in advance of the day."

সত্যই শ্রীঅরবিন্দ-মহিমা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আবাহনগীতিতে তাঁ দেশবাসীর হৃদয়-মনে চির-জাগরূপ হ'য়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ খ্রীষ্টাে শ্রীঅরবিন্দের সেই গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ ক'রে তাঁর প্রতি নমস্কার জানিে শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃত মহিমা ও মূল্য সম্বন্ধে স্বীয় অন্তরের গূঢ় উপলব্ধির বিষ প্রকাশ ক'রেছিলেন। তার সম্পূর্ণটাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

নমস্কার

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্তি তুমি। তোমা লাগি' নহে মান
নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন,—
যার লাগি' নর-দেব চির রাত্রি দিন
তপোমগ্ন; যার লাগি' কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়াছেন সংকট-যাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন। তাই উঠে বাজি'
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে

দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি' দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো। জয় তব জয়!
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিয়া খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল?
মোছ্ রে, দুর্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল॥

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি? শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন; যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন—
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে; দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দশা ল'য়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়,
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে;
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।
বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,

মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি' দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝংকার,
নাহি তাহে দুঃখ-তান নাহি ক্ষুদ্র লাজ
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণ-পিঞ্জর টুটি'—বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব!
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ই ভাদ্র ১৩১৪

সেই সময় থেকে পরবর্তী কালে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে জাতীয়দলের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে পরিগণিত হন যা তিনি এতদিন ছিলেন গোপনে। বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে তখন হ'তে তিনি হন একজন মুখ্যনেতা, জাতীয়-আন্দোলনের নীতি এবং যুদ্ধ-কৌশল পরিচালনার প্রধান নিয়ন্তা ও সংগঠনকর্তা।

শ্রীঅরবিন্দের প্রধান কাজ ছিল, ভারতের জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার চিন্তাধারা বিস্তৃত এবং প্রতিষ্ঠিত করা, আর সেই সঙ্গে প্রথমে একটি দলকে অগ্রগামী ক'রে পরে সমগ্র জাতিকে জমাট এবং সংঘবদ্ধ-ভাবে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করা, যাতে ক্রমান্বয়ে সমগ্র জাতি গিয়ে পৌঁছতে পারে তার লক্ষ্য-সিদ্ধির পথে। তিনি চেয়েছিলেন, কংগ্রেসকে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট কেবলমাত্র আবেদন-নিবেদনকারী একটি কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান হিসাবে না রেখে তাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার ক'রে বিপ্লব-প্রচারের যন্ত্ররূপে পরিণত ক'রতে। তিনি এ-ও স্থির ক'রেছিলেন, কংগ্রেসকে যদি তাঁদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অধিকার করতে পারা না যায়, তবে দেশে কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সংঘ সৃষ্টি করতে হবে যার দ্বারা সে কাজ হবে সম্ভবপর; তা' হবে বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত ষ্টেটের মধ্যে পৃথক স্বনিয়ন্ত্রিত ষ্টেট, যা দেশবাসীকে নির্দেশ প্রদান করবে

শৃঙ্খলাবদ্ধ সংঘ এবং সমিতিসমূহ গ'ড়ে তুলতে, যে-সব সমিতি হবে তাঁদের কাজ আরম্ভ করবার উপায়স্বরূপ। কারণ, শ্রীঅরবিন্দ এটা ভালভাবে বুঝেছিলেন যে, দেশে ক্রমবর্ধমান অসহযোগ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় জেগে ওঠা একান্ত প্রয়োজন যা বিদেশী সরকারের পক্ষে রাজ্য-পরিচালন বিষয়ে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করবে, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাকে অসম্ভব ক'রে তুলবে। দেশে একটা সর্বজনীন অশান্তির সৃষ্টি করা যা ব্রিটিশের দমননীতিকে ক'রে ফেলবে দুর্বল, এবং অবশেষে, প্রয়োজন হ'লে সমগ্র দেশব্যাপী করতে হবে বিদ্রোহ ঘোষণা, শ্রীঅরবিন্দের এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছিল: ব্রিটিশ বর্জন, সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্থলে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, দেশীয় আইন-আদালতের সৃষ্টি, যাতে দেশবাসী বিদেশী আইন-বিচারের উপর নির্ভর না ক'রেও চলতে পারে; দেশে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সৃষ্টি, যা হবে প্রকাশ্য বিদ্রোহের পক্ষে সৈন্য-সৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ এবং প্রকৃতরূপে কাজ আরম্ভের সময় সকল বিষয়ে উপযোগী। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যে প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন তা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। কারণ ১৯১০ খ্রীঃ রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়িয়ে তিনি পণ্ডিচেরী প্রয়াণ করেন। তাঁর অনুপস্থিতির ফলে তাঁর কর্মসূচীর অনেক কিছুই চাপা প'ড়ে যায়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাজনৈতিকক্ষেত্রে ভারতবাসীর সমগ্র মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন ক'রে, স্বাধীনতা অর্জনকে জাতির লক্ষ্য হিসাবে স্থির ক'রে দিয়ে যান আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি তাঁর দেশবাসীকে দিয়ে যান অসহযোগ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে তার মুখ্য নীতি হিসাবে। এমন-কি, বর্ধিতরূপে ইতস্ততঃ সংঘটিত বিদ্রোহের সময়ে এই নীতির অসম্পূর্ণ প্রয়োগও জাতির বিজয় লাভের পক্ষে যথেষ্ট হ'য়েছে। শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতকালে অনুগামী ঘটনাবলীর গতি অধিকাংশরূপে শ্রীঅরবিন্দ-প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হ'য়েছিল; শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান জাতীয় দল কর্তৃকই অধিকৃত হয় এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনকেই তার লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করে ও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য সংবদ্ধ হয়। দেশের অধিক সংখ্যক মুসলমান এবং অল্পসংখ্যক নিম্নজাতি ব্যতীত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তাকে নেতারূপে মেনে নিতে সমগ্র জাতিকে বাধ্য করে এবং কার্যতঃ তখন স্বাধীন না হলেও, দেশে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করে তুলতে কংগ্রেস সমর্থ হয়, আর ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকার ক'রে নিতে ব্রিটিশকে করে বাধ্য।

জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে এবং 'বন্দেমাতরম্' প্রচারে

প্রথমতঃ শ্রীঅরবিন্দ ঘটনাবলীর পিছনে থেকেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মে অংশ গ্রহণ করেন ; বরোদার চাকুরি পরিত্যাগের বিষয় তিনি তখনও স্থির করেননি, তবে তিনি বিনা বেতনে দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়েছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে গুপ্তচক্রের বিপ্লবকর্ম পরিচালন ছাড়াও তিনি বরিশাল সভায় যোগদান করেন, যে সভা পুলিস কর্তৃক ভেঙে দেওয়া হয়। ঐ সময়েই তিনি বিপিন পালের সঙ্গে পূর্ববাংলা ভ্রমণ করেন এবং কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন।—ঐ সময়েই তিনি বিপিন পালের সহিত 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদন কার্যেও যোগদান করেন এবং বাংলাদেশে নূতন রাজনৈতিকদল প্রতিষ্ঠা ক'রে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত হন ; সেই অধিবেশনে চরমপন্থীরা, তখন সংখ্যালঘু হলেও, তিলকের নেতৃত্বে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর কতক অংশ মেনে নিতে কংগ্রেসকে বাধ্য করে। কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আবশ্যক মতো সুযোগ পান, তখন বরোদার চাকরি ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। রাজা সুবোধ মল্লিক, যিনি শ্রীঅরবিন্দের গুপ্তচক্রের সহকারী ছিলেন, কলকাতায় এসে শ্রীঅরবিন্দ যাঁর বাড়ীতে থাকতেন, তিনি একাই একলক্ষ টাকা দান করে এই জাতীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং মাসে দেড়শ' টাকা বেতনে শ্রীঅরবিন্দকে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে বরণ করে বাংলাদেশে আনবার জন্য অগ্রণী হয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সুতরাং এইবার দেশের কাজে তাঁর সবখানি সময় নিয়োজিত করবার বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি অনেকদিন থেকে তাঁর সাপ্তাহিক পত্রে দেশের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং অসহযোগ নীতির বিষয় বিবৃত করছিলেন, এখন তিনি 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি দৈনিক পত্র প্রকাশ করলেন, কিন্তু এ তাঁর একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হবারই কথা, কারণ নিজের হাতে মাত্র পাঁচশ' টাকা নিয়েই তিনি এই সাহসিক কাজে নেমেছিলেন এবং ভবিষ্যতে অর্থ-সাহায্য পাওয়ারও তেমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বললেন এই প্রচেষ্টায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে। শ্রীঅরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে তাতে সম্মত হলেন, কারণ তিনি, জনসাধারণের মধ্যে তাঁর বিপ্লবের কাজ আরম্ভ করবার এ একটা পরম সুযোগ বলে বুঝলেন।

শ্রীঅরবিন্দের কলিকাতা-বাসের যে সব তথ্য তাঁর সহকর্মী এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বিবৃতিতে পাওয়া গেছে তারই কি পরিচয়ছু নিয়ে দেওয়া হ'ল—

বরোদার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় এসে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে কিছুদিন থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ-যে প্রকৃতই এ-জগতের মানুষ নন, তাঁর স্থান যে মানবতার গণ্ডীর বহু ঊর্ধ্বে, তিনি-যে সত্যই মানুষরূপী দেবতা, তাঁর সেই দেবত্বের স্বরূপটি তখন থেকেই অনেকের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। সে-যুগের দেশকর্মী এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র কুমার গুহরায় মহাশয় রাজা সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে যখন প্রথম শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেন তখন শ্রীঅরবিন্দমূর্তি তাঁর সম্মুখে দেবতারূপেই প্রতিভাত হ'য়েছিল। নগেনবাবু তাঁর সেই উপলব্ধির কথা যা প্রকাশ ক'রেছিলেন তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বারীনদা এবং শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য প্রায় রোজই যেতেন। একদিন শ্রীঅরবিন্দ অবিনাশবাবুকে ব'ললেন—"অবিনাশ, আমি এখানে থাকতে পারছি না—একটা ব্যবস্থা কবতে পার ?"—"কেন এখানে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট বা অসুবিধা আছে কি ?"—সেজন্য না, আদর-আপ্যায়ন বা আহার-বিহারের কথা নয়—এখানে আমি থাকতে চাই না ব'লে—এখানে থাকার বিশেষ অসুবিধা এই যে, সাধারণের গতি এখানে সুগম নয়।

শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব বুঝতে পেরে অবিনাশবাবু বারীনদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ছকু খানসামা লেনে একটি বাড়ী ভাড়া নেন এবং সেখানে বারীনদা, অবিদা এবং সরোজিনী দেবী শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বাস করেন। পরে তাঁরা ২৩নং স্কটস লেনের বাড়ীতে উঠে যান। এখানে বারীনদা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। তাঁদের কাজ ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠছিল, সে-কারণে শ্রীঅরবিন্দ কতকটা নিরাপত্তা এবং সুবিধার জন্য কাজকর্ম বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে দেন। বারীনদা মুরারীপুকুর বাগানে বোমার ব্যাপার নিয়ে থাকেন আর প্রচার-বিভাগের ভার পড়ে অবিনাশ ভট্টাচার্যের ওপর। যুক্তি-পরামর্শের জন্য বারীনদা দরকার মতো স্কটস্ লেনের বাড়ীতে আসতে পারবেন এবং বিশেষ প্রয়োজন না-হ'লে, অবিনাশবাবু বাগান-বাড়ীতে যেতে পারবেন না—এই রকম স্থির হয়। মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ীটা

বারীনবাবুদেরই ছিল—সাত বিঘা জমি, একটা ভাল শান-বাঁধানো পুকুর, একটা ডোবা, আম-কাঁঠাল নারিকেল বাঁশ এবং সুপারি প্রভৃতি গাছে পূর্ণ,—একতলা একটা বাড়ী, তাতে তিনখানা ঘর ও বারান্দা।

স্কটস্ লেনের বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মৃণালিনী দেবী, সরোজিনী দেবী এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য থাকতেন। কিছুদিন পরে সেখানে শৈলেন বসুকে আনা হয়।

এই সময় শ্রীঅরবিন্দের বেশির ভাগ সময় ধ্যানস্থ অবস্থাতেই কেটে যেত। তারই মধ্যে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি রচনাও তাঁর চলতো। লোকজন এলে হাসিমুখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন আবার নীরবে ধ্যানস্থ হ'তেন। 'বন্দেমাতরমে'র প্রবন্ধের জন্য লোক এলে তাকে অপেক্ষা করতে ব'লে লেখা শুরু করতেন। কখনও লেখার দিকে চেয়ে কখনও-বা সেদিকে দৃষ্টি না দিয়েই সমানে লিখে চ'লেছেন, কলম বা পেন্সিল মোটে থামতো না, কয়েক পৃষ্ঠা লেখার পর অবিদাকে ব'লতেন—"এতেই হ'য়ে যাবে, কেমন ?"—"হ্যাঁ" ব'লে অবিদা সেই লেখা নিয়ে প্রেসে পাঠিয়ে দিতেন।

সংসারে পরিবারবর্গের মধ্যে বাস ক'রেও শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারী তপস্বী এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ; লোক-জনের সঙ্গে মেলামেশা এবং যোগ রেখেও তিনি যোগমগ্ন যোগেশ্বর ! তাঁর খাওয়া-পরা এবং অন্য কোন প্রকারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই, যা পান তাই খান। পায়ের জুতোর তলা ছেঁদা হয়ে গেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। সত্যই তিনি "নিরাশী অপরিগ্রহ যতচিত্তাত্মা নিত্যসংন্যাসী"। কিন্তু তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী নন, তিনি গৃহস্থ-সন্ন্যাসী—গীতোক্ত যোগের পূর্ণ অধিকারী। তাই-না তাঁর কারাবাস-কালে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং—এই কলিযুগে—তাঁরই হাতে গীতা তুলে দিয়েছিলেন সেই অব্যয় যোগকে (যোগং অব্যয়ম্) অখণ্ডভাবে মনুষ্য-সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ;—যে-যোগ শ্রীকৃষ্ণ এই সৃষ্টিতে সর্বপ্রথম বলেছিলেন বিবস্বান্‌কে। সূর্য বলেছিলেন মানব-পিতা মনুকে, মনু সূর্যবংশের আদিপুরুষ ইক্ষাকুকে, এবং যে-যোগ পরে নিমি, জনক, কৈকেয় আদি রাজর্ষিবর্গ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন ; যে-যোগের বিষয় দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত এবং প্রিয়সখা অর্জুনের নিকট বিবৃত ক'রে মন্তব্য করেছিলেন—ইহাই শ্রেষ্ঠ রহস্য—"এতৎ উত্তমং রহস্যম্।" এই কলিযুগে সেই যোগের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা গেল শ্রীঅরবিন্দ-জীবনে। স্বীয় জীবনে সেই যোগকে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠা ক'রে ভারতের যুবকদের তিনি আহ্বান জানালেন তাতে দীক্ষিত হ'তে। তাই

শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য একদিন যখন কথা-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন—"সেজদা, তুমি এদিকে যোগতপ কর আবার স্ত্রীকে নিয়ে এক বিছানায় শোও, এ কী রকম তপস্যা?" সদাপ্রসন্ন শ্রীঅরবিন্দ তখন মধুর হাসি হেসে অবিদাকে বলেছিলেন—"স্ত্রীকে নিয়ে শুলেই ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হয় না। একদল নাগা সন্ন্যাসী আমি গড়তে চাই না। ভারতে সেরূপ ৩৩ লক্ষ সন্ন্যাসী আছে। আমি চাই গৃহস্থ সন্ন্যাসী—যারা ঘর-সংসার সবই করবে আবার দরকার হ'লে সব ফেলে ছুটে আসবে কর্ত্তব্যের তাড়নায়।"

সন্ন্যাসের মোহ থেকে জাতিকে রক্ষা ক'রে ভারতভূমিতে আর্যগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি "ধর্ম্ম" পত্রিকায় বাংলার যুবকদের প্রতি সাবধান-বাণী প্রয়োগ ক'রে লিখেছিলেন—"আমাদের যেরূপ কাল ও অবস্থা আগত, তাহাতে রজঃ ও সত্ত্ব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও জ্ঞান জাগাইয়া তমোবর্জ্জনপূর্ব্বক দেশের সেবায় ও জগতের সেবায় জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক বল পুনরুজ্জীবিত করা এখন কর্ত্তব্য। এই জীর্ণশীর্ণ তমঃপীড়িত স্বার্থসীমাবদ্ধ জাতির ঔরসে জ্ঞানী, শক্তিমান ও উদার আর্য্যজাতির পুনঃসৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থই বঙ্গদেশে এত শক্তিবিশিষ্ট যোগবলপ্রাপ্ত জীবের জন্ম হইতেছে। ইহারা যদি সন্ন্যাসের মোহিনীশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ ও ঈশ্বরদত্ত কর্ম প্রত্যাখ্যান করেন, তবে ধর্মনাশে জাতির ধ্বংস হইবে।"

জাতীয় বিদ্যালয় থেকে মাসে যে দেড়শো টাকা মাত্র পাওয়া যেত, সেই সামান্য পরিমাণ অর্থই তখন শ্রীঅরবিন্দের মাসিক আয়, তাতেই সংসারের সমস্ত খরচ চালাতে হ'ত। শেষে তাও আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। কারণ তাঁর রাজনীতি পরিচালনার ব্যাপারে জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ালো, সুতরাং তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা থেকে অবসর নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সংসার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ একেবারে নির্বিকার। ও-বিষয়ে অবিনাশবাবুকেই ভাবতে হ'ত বেশী। অবিদাকে সে সময় মাঝে-মাঝে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে টাকা ধার করতে হ'ত আবার সুবিধা মতো অবিদা তাঁর ঋণ পরিশোধও ক'রে দিতেন।

স্কট লেনের বাসায় অনেকেই আসতেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। যাঁরাই শ্রীঅরবিন্দের সংস্রবে এসেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন তাঁর শিশুর মতো সরল হাসি ও আচরণ দেখে। এই সময় বিষ্ণু ভাস্কর লেলে তাঁর এক শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হন। লেলের আসার

পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনা বিশেষভাবে বেড়ে চলতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ বাড়ীর সকলের সঙ্গে ডাল-ভাত যা-ও বা খাচ্ছিলেন তা-ও এখন বন্ধ ক'রে দিলেন, তখন তাঁর খাদ্য হ'ল একমুঠো চালের ভাত আর আলু কিম্বা কাঁচকলাভাতে। অবিদা এই সব দেখে-শুনে শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রমাদ গণলেন, তিনি মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভাতের মধ্যে একটু ক'রে ঘি দেবার ব্যবস্থা করলেন।

লেলে মহারাজ ক্রমেই সেখানে চেপে বসতে লাগলেন, তাই দেখে অবিদা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন, তিনি ভাবলেন, তাঁদের সব বুঝি পণ্ড হ'য়ে যায়। মুরারিপুকুর বাগানবাড়ীতে গিয়ে তিনি উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর বারীনদাকে সব কথা জানালেন। কিন্তু লেলে মহারাজের প্রভাব থেকে শ্রীঅরবিন্দকে সরিয়ে নেওয়ার কোনো উপায় তাঁরা ভেবে পেলেন না। সরোজিনী দেবীও খুব চিন্তিতা হ'য়ে পড়'লেন। অবিদা ভাবতে লাগলেন কী ক'রে লেলে মহারাজকে বিদায় করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ যাঁর কাছে যোগাভ্যাস করছেন তাঁকে অসম্মান করার কথা চিন্তাও করা যায় না। অবিদা লক্ষ্য করলেন, লেলে মহারাজ ওদিকে মৃণালিনী দেবীকেও যোগতপ শেখাতে আরম্ভ করেছেন। অবিদা আরও হতাশ হ'য়ে পড়লেন, তিনি মৃণালিনী দেবীকে বললেন,—"তুমিও ওতে গোড় দিলে বউদি।" এর উত্তরে মৃণালিনী দেবী বললেন—"কি করবো ভাই, আমি পিছন টান হ'তে চাই না। তাঁর পিছু পিছু চলতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো।"

অবিদা আর থাকতে না পেরে লেলে মহারাজকে বললেন—"আপনি আমাদের সর্বনাশ না ক'রে ছাড়বেন না? কবে আপনি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছেন?" লেলে মহারাজ হাসিমুখে বললেন—"তোমাদের সংকল্প সিদ্ধ হবেই, ভারতের মুক্তি আসন্ন, কিন্তু তোমাদের এ-পথে নয়। আমার কথা বিশ্বাস করো।" অবিদা জিজ্ঞাসু মনে প্রশ্ন করলেন—"আসন্ন মানে?" "এই ধরো ৫০ বছর।" অবিদা অম্নি ব'লে উঠলেন—"ওরে বাপ্‌রে, পঞ্চাশ বছর! না, না, তা হবে না। বড় জোর দশ বছর। তার চেয়ে বেশী যেতে দেব না।"

লেলে মহারাজ সস্নেহে অবিদার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন— "এ পথ একদিন তোমাদেরও ধরতে হবে।" উত্তরে অবিদা বললেন—"আমরা রাজসিক প্রকৃতির লোক ও-সব তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।"—"শুনতে হবে, এ পথে তোমাদের আসতেই হবে।"

লেলে মহারাজের বিদায় নেবার ক'একদিন আগে শিবরাত্রির উপবাস ক'রে তাঁরা সবাই মিলে বেলুড়মঠে যান। বৈকাল বেলায় যখন তাঁরা প্রসাদ পেলেন তখন অবিদা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন—শিবরাত্রির উপোস ক'রে প্রসাদ খাবেন কি না। অবিদার সেই ভাব লক্ষ্য ক'রে শ্রীঅরবিন্দ ব'লে উঠলেন—"খেয়ে ফেল খেয়ে ফেল"। অবিদা বললেন—"আজ যে উপোস ক'রে আছি তাই ভাবছি।" শ্রীঅরবিন্দ অমনি ব'লে উঠলেন—"এ-যে রামকৃষ্ণ দেবের প্রসাদ, শিগ্‌গির খেয়ে নাও।" শ্রীঅরবিন্দ এবং লেলে মহারাজ আগেই শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

আর-একদিন বিকেলে তাঁরা চারজন মিলে কালিঘাটে গিয়েছিলেন কালী দর্শন করতে। ভালভাবে দর্শনাদি হওয়ার পর প্রণামীর পরিমাণ নিয়ে সেবাইতদের সঙ্গে বচসা আরম্ভ হয়, পরে মারামারি শুরু হ'য়ে যায়। লেলে মহারাজের শিষ্যটা বেশ সাহসী এবং বলিষ্ঠ ছিল, সে সেবাইতদের বেশ ঘা-কতক দিল। কাণ্ড দেখে লেলে মহারাজ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে বের হ'য়ে আসেন। অবিদা তখনই হরিদাস হালদারের বাড়ীতে যান কিন্তু তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে আসেন। পরের দিন হালদার মহাশয়কে 'বন্দেমাতরম্' আপিসে উক্ত ব্যাপার জানানো হয়। তিনি সেবাইতদের শাসন ক'রে দেন এবং শ্রীঅরবিন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্য প্রায় প্রত্যহই লোকের ভিড় হ'ত। এতে শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনার কিছুটা অসুবিধা হ'ত বৈ কি। এ বিষয়ে তিনি একদিন অবিদাকে জানালেন। অবিদা-ও একটু অসুবিধায় পড়লেন—কী করে তাঁদের নিষেধ করেন। তবুও অবিনাশবাবু বিনীত অনুরোধে অনেককেই বিদায় করতেন, কিন্তু সবাইকে পারতেন না। বাঙ্গালী ছাড়া অনেক অবাঙ্গালীও আসতেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে।

একদিন বেলা প্রায় বারোটার সময় একজন অবাঙ্গালী এসে হাজির, বেশ সৌম্যদর্শন পুরুষ, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা কইতে চান। অবিদা তাঁকে একঘণ্টা পরে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন। আগন্তুক কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললেন—"বেশ, এই বৈঠকখানায় ব'সে তোমার সঙ্গে কথা কই, তা' হ'লেই একঘণ্টা কেটে যাবে।" এমন হাসিমুখে তিনি কথাগুলি বললেন যে অবিদা আর তাঁর কথা ফেলতে পারলেন না, তাঁর সঙ্গে বসে কথা কইতে লেগে গেলেন। অবিদা বেশ আনন্দই পাচ্ছিলেন ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা ব'লে। পনেরো মিনিট আন্দাজ এই ভাবে কেটে গেছে, এমন সময় শ্রীঅরবিন্দ চটি

পায়ে ধীরে ধীরে ওপর থেকে নেমে আসছেন ; দূর থেকে বৈঠকখানা-ঘরে ভদ্রলোকটিকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে ব'লে উঠলেন—"আরে, তিলক !" কথা শুনে অবিদা একেবারে চম্‌কে উঠলেন, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়েছেন, তিনি বালগঙ্গাধর তিলক ! অবিদা তখনই তাঁর পায়ের উপর হেঁট হ'য়ে প'ড়ে ক্ষমা চাইলেন। অবিদাকে হাত ধরে তুলে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তিলক বললেন—"তুমি তো কিছু অন্যায় করনি, তবে ক্ষমা কিসের ?"—"আপনি বালগঙ্গাধর তিলক, এ-কথা কেন এতক্ষণ আমাকে বলেননি, তা হ'লে আমি ডেকে দিতাম।"— "তা জানি। অরবিন্দ বিশ্রাম করছেন বুঝতে পেরেই আমার পরিচয় তোমায় দিইনি।"

এতেই বোঝা যায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তিলকের পরিচয়ের পর থেকে তাঁদের উভয়ের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল।

শ্রীঅরবিন্দ এই সময় কংগ্রেসে যুবকদের ফরওয়ার্ড দলের একটা সভা আহ্বান করলেন এবং তারপর প্রকাশ্যে তাদের একটি নূতন রাজনৈতিক-দলরূপে সংঘবদ্ধ ক'রে, মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে পরিচালিত দলের সাথে মিলিত করলেন—মডারেট দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হবার জন্য, যে সংঘর্ষ কলকাতার অধিবেশনে দেখা দিয়েছিল। এই নূতন মিলিত সংঘকে তিনি উপদেশ দিলেন, 'বন্দেমাতরম্' দৈনিককে তাদের দলের মুখপত্র হিসাবে গ্রহণ করতে। তখন 'বন্দেমাতরম্‌কে' অর্থ সাহায্যের জন্য 'বন্দেমাতরম্ কোম্পানি' গঠন করা হল, যার পরিচালনভার বিপিন পালের অনুপস্থিতকালে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং গ্রহণ করলেন ; বিপিন পালকে তখন পাঠানো হ'য়েছিল বিভিন্ন জেলায় নূতন দলের উপযোগিতার এবং কর্মসূচীর বিষয়ে প্রচারের জন্য। এই নূতন দল প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই কৃতকার্য হয়, এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকা সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রচার হ'তে থাকে। 'বন্দেমাতরমে' কেবল শ্রীঅরবিন্দ এবং বিপিন পালই ছিলেন না—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয় চ্যাটার্জী ইত্যাদি অপর কৃতী লেখকগণও ছিলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর এবং বিজয় চ্যাটার্জির ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট দখল ছিল এবং তাঁদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল ইংরাজী রচনার। শ্যামসুন্দরবাবু কতকটা শ্রীঅরবিন্দের ধরণে লেখা আয়ত্ত ক'রেছিলেন, এবং পরে তাঁর লেখাকে অনেকে শ্রীঅরবিন্দের রচনা ব'লেই মনে করতেন। কিন্তু এর কিছুকাল পরে, একদিকে বিপিন পাল এবং অপরদিকে কোম্পানির ডিরেক্টর ও অংশীদার, এই উভয় পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, রাজনৈতিক বিষয়ে মতের পার্থক্যই এর কারণ,

বিশেষ ক'রে, গুপ্তচক্রের বৈপ্লবিক কার্যের বিষয়ে। অপর পক্ষ এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, বাধাপ্রদান করলেন বিপিন পাল। কিন্তু বিপিন পাল 'বন্দেমাতরম্' থেকে আলাদা হ'য়ে যাওয়ায় উক্ত বিষয় মিটমাট মিটে যায়। বন্দেমাতরমের সঙ্গে বিপিন পালের সংস্রব ত্যাগ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ কিছুতেই রাজী হতেন না, কারণ বিপিন পালের মতো গুণী ব্যক্তিকে তিনি বন্দেমাতরমের একটি সম্পদ হিসাবে গণ্য করতেন, যদিও রাজনৈতিক কর্ম-পরিচালন বিষয়ে বিপিনপাল তেমন পারদর্শী নেতা ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন দেশের একজন শ্রেষ্ঠ এবং আদি রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্, একজন উৎকৃষ্ট লেখক এবং শক্তিশালী বক্তা। কিন্তু এই বিচ্ছেদ সংঘটিত হ'য়েছিল শ্রীঅরবিন্দের অগোচরে, যখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হ'য়ে ধীরে ধীরে সেরে উঠছিলেন।··· শ্রীঅরবিন্দের নাম তাঁর অনুমতি না নিয়েই বন্দেমাতরমের এডিটররূপে প্রকাশ করা হ'য়েছিল, কিন্তু তা মাত্র একদিনের জন্যই, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ ঐভাবে তাঁর নাম প্রকাশ করা বন্ধ ক'রে দেন, এইজন্য যে, তখনও বরোদা-সার্ভিসে তাঁর নাম বলবৎ ছিল, এবং কোনো রকমেই তিনি সাধারণে তাঁর নাম প্রচারের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। সে যা-ই হোক, তারপর থেকে 'বন্দে-মাতরম'কে এবং বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত সংঘকে তিনি নিজের আয়ত্তে রেখে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ক'রেছিলেন। বিপিনপাল ব্রিটিশ কর্তৃত্বমুক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাকেই নূতন দলের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা ক'রেছিলেন, কিন্তু তাতে মডারেটদের লক্ষ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনকেই নির্দেশ করা হ'য়েছিল, এবং দাদাভাই নৌরজী কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি-রূপে চরমপন্থীদের 'স্বরাজ'কে এই অর্থেই (কলোনিয়াল সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্ট) অধিকার করতে প্রয়াসী হ'য়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম কাজ হ'য়েছিল: ভারতের রাজনৈতিক কর্মে ও প্রচেষ্টায় পূর্ণ স্বাধীনতাকেই তাহার লক্ষ্য হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা, এবং 'বন্দেমাতরমের' পাতায়-পাতায় তারই উপর জোর দিয়ে চলা হ'য়েছিল: "আমরা ব্রিটিশ-অধিকারমুক্ত পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্য চাই"। সে-যুগের বিপ্লবী কর্মী শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ-বিষয়ে তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় লিখেছেন—"আজকাল এ-কথাটা হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে খুব সস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সেকালে বড় বড় রাজনৈতিক পাণ্ডারা মুখ ফুটিয়া ও-কথাটি বাহির করিতেন না, তাঁহারা ভাজিতেন ঝিঙ্গা আর বলিতেন পটল। যখন সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্ট

সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার পিছনে 'কলোনিয়াল্' কথাটা জুড়িয়া দিয়া শ্যাম ও কুল দুই-ই রক্ষা করিতেন। কিন্তু 'বন্দেমাতরমে' একেবারে ছাপার অক্ষরে ঐ কথাগুলি দেখিয়া আমার মনটা তড়াক করিয়া নাচিয়া উঠিল।" 'স্বরাজ' শব্দে শ্রীঅরবিন্দ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতাকে নির্দেশ করেছিলেন। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক নেতা যিনি প্রকাশ্যভাবে সর্বসাধারণের মাঝে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে প্রচার করতে সাহসী হয়েছিলেন এবং তিনি অবিলম্বেই সে বিষয়ে কৃতকার্য হন। নূতন সংঘ 'স্বরাজ' কথাটাকে স্বীয় আদর্শ প্রচারের বাণী হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং তা দ্রুত গতিতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস একে তার আদর্শরূপে গ্রহণ ক'রেছিল অনেক পরে—করাচী অধিবেশনে, যখন কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান জাতীয়তাবাদী নেতাদের দ্বারা সংশোধিত এবং পুনর্গঠিত হয়, এবং পূর্ণ স্বাধীনতাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় আরও পরে, ১৯২৯ সালে, কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে। যে-নীতি শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রেছিলেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেই।

'বন্দেমাতরমে' প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিবাণী জাতীয় জাগরণে যে কি রকম মন্ত্রের মতো কাজ করতো, বলাই দেবশর্মা মহাশয় তার একটি সুন্দর চিত্র বর্ণনা ক'রেছেন তাঁর 'অরবিন্দ' প্রবন্ধে—

"বন্দেমাতরম্ অফিসের একটু চিত্র দিতেছি। সম্ভব স্কটস্ লেনে সে সময় বন্দেমাতরম্ অফিস। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কাগজের অন্যান্য কর্ম্ম সম্পূর্ণপ্রায়। অবশিষ্ট আছে কেবল সম্পাদকীয় নিবন্ধ। শ্রীঅরবিন্দ আত্মভোলা কবির মত বসিয়া আছেন, অথবা যোগমগ্ন যোগীর মত আত্ম-সমাহিত। শ্যামসুন্দর বাবু আসিয়া সম্পাদকীয় চাহিলেন। শ্রীঅরবিন্দ প্যাকিং-এর একটা ছেঁড়া কাগজ টানিয়া লইলেন এবং সেই টুকরা কাগজের এক কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে তাঁহার রচনা-কার্য্য শেষ করিয়া দিলেন। কোথাও একটু কাটিলেন না কুটিলেন না, কোথাও একটু থামিলেন না—ভাবিলেন না। পরদিন প্রত্যূষে সেই লেখা জাতীয়তার সামস্তোত্ররূপে প্রকাশিত হইল। স্বৈর শাসক তাহাতে কাঁপিয়া উঠিল, জাতির প্রাণে প্রাণাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সজলস্নিগ্ধ কর্দ্দমাক্ত বাংলায় বজ্রাগ্নি ঝলকিয়া গেল! অযুতকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—'রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা-ধন।"

এতেই বোঝা যায় ভারতবাসীকে সচেতন ক'রে তুলতে তখন বাংলাদেশের জাগরণ বাণী শ্রীঅরবিন্দকণ্ঠে ঝংকৃত হ'য়েছিল—দ্রষ্টা কবির ভাষায়—

"... ... ...ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝংকার।"

'বন্দেমাতরম্' দেশের জাতীয় দলের কর্মসূচী সর্বত্র ঘোষণা করে এবং গতঃ তাকে শক্তিমান করে গড়ে তোলে: অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, দেশী-গ্রহণ এবং বিদেশী বর্জন, জাতীয় শিক্ষা, দেশীয় আদালত এবং বিচারালয় তিষ্ঠা এবং শ্রীঅরবিন্দ-পরিকল্পনার আরও বহু বিষয় জাতীয়দলের কর্ম-ালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' (প্যাসিভ রেজিস্‌ট্যান্স) বিষয়ে অরবিন্দ উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ব্রিটিশের ায়-বিচার এবং তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও বিধি-ব্যবস্থার প্রতি মডারেটদের াস্থা এবং নির্ভরতার বিষয়ে ভ্রান্তি প্রদর্শন ক'রে তিনি অন্যান্য প্রবন্ধও ন্দেমাতরমে প্রকাশ করেন; যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা তিনি জাতিকে এ বিষয়ে ভাল রে বুঝিয়ে দেন যে, এমন কি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী শাসন-ব্যবস্থা দেশের পক্ষে নুকূল এবং সহায়শীল হ'লেও জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে তা উপযোগী এবং াস্থ্যকর হতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দের উক্তরূপ প্রচারের ফলে জাতীয়দলের মতবাদ সর্বত্রই মর্থন লাভ ক'রেছিল, বিশেষ ক'রে পাঞ্জাবে, যেখানে এত দিন ডারেটদের প্রাধান্যই ছিল প্রবল। 'বন্দেমাতরম্' শিক্ষিত জনসাধারণের নের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে বিপ্লবের জন্য তৈরী ক'রে তুলতে যভাবে প্রচারকার্য চালায় তাতে উক্ত পত্রিকা সাংবাদিক-ইতিহাসে াম্পূর্ণরূপে একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে 'বন্দেমাতরম্' ছল দুর্বল, কারণ চরমপন্থীরা তখনও ছিল দরিদ্রের সংঘ। শ্রীঅরবিন্দ যতদিন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কার্যতঃ তাকে নিজের আয়ত্তে রেখেছিলেন, ততদিন তিনি বহু কষ্টে কাগজটিকে চালিয়ে যাবার পক্ষে সাধারণের সহায়তা লাভ ক'রতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছামতো তাকে বিস্তৃত করবার পক্ষে নয়। শ্রীঅরবিন্দ যখন গ্রেপ্তার হ'য়ে এক বৎসরকাল জেলে ছিলেন সেই সময়ে 'বন্দেমাতরমের' আর্থিক অবস্থা সঙ্গীণ হ'য়ে পড়ে। অবশেষে এ-ই স্থির হয় যে, খাদ্যাভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে বরণ না ক'রে গৌরবপূর্ণকালে

স্বেচ্ছামৃত্যুই পত্রিকার পক্ষে শ্রেয়ঃ। সুতরাং বিজয় চ্যাটার্জী মহাশয়
নির্দেশ দেওয়া হয় এমন একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে যে, যার ফলে গভর্ণ
আইন জারী করে পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেবে। ...শ্রীঅরবিন্দ সর্ব
'বন্দেমাতরমের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি অতি সতর্কতার সহিত রচনা করতে
যাতে গবর্ণমেণ্ট প্রসিকিউশানের ব্যাপারে কিংবা কাগজটিকে বন্ধ করে দেও
বিষয়ে আইন-বিরুদ্ধ কিছু না পায়। এ বিষয়ে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার এডি
অভিযোগ করে লিখেছিলেন—"বন্দেমাতরমের প্রতিটি ছত্র বাহ্যতঃ রাজদ্রো
গন্ধে পরিপূর্ণ, কিন্তু উহা এরূপ চতুরতার সহিত লিখিত যে, আইনতঃ কি
করা যায় না।"...অবশেষে ব্যবস্থা মতো পন্থা অবলম্বনে ফল পাওয়া গে
শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতকালে 'বন্দেমাতরমে'র আয়ুষ্কাল হল নিঃশেষ।

ব্রিটিশপণ্য-বর্জন, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন এবং স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন

লোকমান্য তিলক এবং "শ্রীঅরবিন্দ, উভয়েই, কার্যকরীভাবে ব্রিটিশপণ্য-র্জনের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র ব্রিটিশ পণ্যই ; কারণ ঐসব জিনিষের প্রয়োজন মেটাতে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে দেশে তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং তাঁরা ব্রিটিশপণ্যের স্থলে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং আমেরিকার পণ্য ব্যবহারের নির্দেশ দেন, যাতে ইংলণ্ডের উপরেই সমস্ত চাপ পড়ে। বর্জন-নীতিকে তাঁরা কেবল মাত্র স্বদেশীর সহায় হিসাবেই গ্রহণ করেন নি, তা ছিল তাদের রাজনৈতিকযুদ্ধের অস্ত্রস্বরূপ।...জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন ছিল তাঁদের কর্মসূচীর অন্যতম বিষয়বস্তু, যার উপর শ্রীঅরবিন্দ অধিক জোর দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ প্রথায় স্কুল কলেজ-সমূহে যে-সব শিক্ষা দেওয়া হত তার উপর শ্রীঅরবিন্দ বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে তিনি বরোদা কলেজে প্রফেসর থাকাকালে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।.....জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে আন্দোলন সবলভাবেই আরম্ভ হয়েছিল, যার ফলে বাংলাদেশে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেকেই তাতে শিক্ষকতা করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তবুও ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত ছিল এবং স্কুলের আর্থিক ব্যবস্থাও ছিল সঙ্গীণ। শ্রীঅরবিন্দ এই আন্দোলনকে নিজের হাতে নিয়ে তার বিস্তার কল্পে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার বিষয় মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বাংলাদেশ থেকে প্রস্থান করায় তাঁর সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়নি।...জাতীয় আদালত গঠনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছিল এবং কয়েকটি জেলায় কাজ আরম্ভ করে তাতে ফলও পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু একই ঝটিকা-প্রবাহে তা-ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দেশে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা কার্যতঃ অধিক প্রাণবন্ত হয়েছিল। কারণ শেষ পর্যন্ত তা যথেষ্ট সতেজ ছিল এবং দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল, আর সেই গঠন হয়েছিল বহুগুণিত এবং তার কর্মীগণ ছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আন্দোলনে তীক্ষ্ণ অস্ত্রস্বরূপ, যে আন্দোলন দেশের মুক্তি অর্জনে বারবার দেখা দিয়েছিল। এ-ই ছিল জাতীয়তাবাদীগণের কর্মসূচী এবং তাঁদের রাজনৈতিক কার্যাবলীর প্রাণসত্তা যা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রূপ নিয়েছিল এবং নিরাশা নির্যাতনের প্রতিটি ঢেউয়ের আঘাতে মুক্তি আন্দোলনের জীবনসূত্রটি হয়েছিল নবীভূত এবং দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বর্ষকালব্যাপী সংগ্রামে কার্যতঃ এক লক্ষ্য হিসাবে জাতি তাকে ধরে ছিল।

ঐ সময়ের মধ্যে সব চেয়ে বড় কাজ এই হয়েছিল যে, দেশে এক নূতন ভাবে নূতন তেজের সৃষ্টি হয়েছিল ; দেশের সর্বত্র জাতি জেগে উঠেছিল সে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের মহাধ্বনিতে। সাহস অবলম্বন করে আশা-ভরসা সহিত এক সঙ্গে কাজ করতে এবং অস্তিত্ববান থাকতে জাতি সেদিন গ অনুভব করেছিল, পুরাতন অলসভাব এবং ভীরুতা তখন গিয়েছিল ভেঙে এমন এক শক্তির উদ্ভব হয়েছিল যাকে অন্য কোন শক্তিই ধ্বংস করতে পারেনি যা বারংবার উত্থিত হয়েছিল ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো, যে পর্যন্ত ন সে-শক্তি ভারতকে পৌঁছে দিয়েছিল তার পূর্ণ বিজয়ের নিশ্চি সূচনার পথে।

বিভিন্ন সভায়

বন্দেমাতরম পত্রিকার মামলার পরে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে একজন সুপরিচিত জাতীয় নেতারূপে পরিগণিত হন। তিনি জাতীয়দলকে পরিচালিত করে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায় যোগদান করেন, সেখানে উভয় দলের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এইবার তিনি এই সর্বপ্রথম সাধারণের বক্তৃতামঞ্চে বক্তারূপে দেখা দেন। সুরাটে বড় বড় সভায় তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সেখানে জাতীয় দলের সভায় সভাপতিত্ব করেন। কলকাতা ফেরবার পথে তিনি কয়েকস্থানে অবতরণ করেন এবং বক্তৃতাশ্রবণের জন্য সমবেত বিরাট জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বাণী প্রদান করেন। পুনরায় তিনি হুগলী প্রাদেশিক সভায় জাতীয় দলকে পরিচালিত করেন। সেখানে সর্বপ্রথম এটা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, দেশে জাতীয়তাবাদ যথেষ্ট উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কারণ উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে জাতীয়দলই সংখ্যাধিক্য অর্জন করে এবং বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে মডারেট দলের সিদ্ধান্তকে পরাজিত ক'রে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করাতে সমর্থ হন। কিন্তু তাতে মডারেটদলের নেতারা জাতীয়দলের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ ক'রবে ব'লে ভয় দেখায়। সুতরাং বিচ্ছেদ এড়াবার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ মডারেট সিদ্ধান্তগুলি পাস হ'তে দেওয়ার বিষয়ে রাজী হন, কিন্তু তিনি সাধারণ সভায় স্বীয় সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও সবাইকে বুঝিয়ে বলেন এবং তাঁদের বিজয়লাভ সত্বেও তিনি জাতীয়দলকে আপাততঃ উক্ত বিষয়ে নীরব থাকতে নির্দেশ দেন— বাংলাদেশে রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে একটা ঐক্য বজায় রেখে চলবার উদ্দেশ্যে। প্রথম দফায় বিজয়গর্বে উৎফুল্ল জাতীয়দলের প্রতিনিধিরা উক্ত নির্দেশ মেনে নেন এবং শ্রীঅরবিন্দের আদেশে মডারেট-সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট না দিয়ে নীরবে সভা-গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে যান। এই ব্যাপারে মডারেট-দলপতিদের মনে অত্যধিক অসন্তোষ এবং চমকের সৃষ্টি হয়, এবং তাঁরা এই ব'লে অভিযোগ করেন যে, দেশের লোকেরা তাদের প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ নেতাদের যুক্তি শুনতে অস্বীকার ক'রে তাঁদের বিরুদ্ধে হৈ-চৈ-এর সৃষ্টি ক'রলো এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন এবং অপ্রবীণ এক ব্যক্তির প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সহিত নীরবে আনুগত্য প্রদর্শন ক'রল।···এতেই বোঝা যায়, রাজনীতিক্ষেত্রে সে-যুগে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব ছিল কত গভীর।

গ্রেপ্তার
এবং কারাবাসকালে ভগবদ্দর্শন

বিচারপতি কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে বোমা ফেলার ব্যাপারেই শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতির সবগুলি মামলাই কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে হ'ত। তাঁরই আদেশে সুশীল সেনকে ১৫ বার বেত্রাঘাত করা হয়। কিংসফোর্ডের সেই অমানুষিক ব্যবহারের জন্যই বিপ্লবীগণ তাঁর উপর খুবই খাপ্পা হ'য়ে ওঠে। সুতরাং কিংসফোর্ডের ভবলীলা সাঙ্গ করবার জন্য বারীনদা খুব সজাগ হ'য়ে উঠলেন। সোজা তাঁর উপর বোমা ফেলে তাঁকে হত্যা করা স্থির হ'ল। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক এবং শ্রীঅরবিন্দ বিচার করে কিংসফোর্ডের প্রতি উক্তরূপ রায় দেন। কিন্তু এই হত্যার রায় দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের সত্যকার মত কতটা ছিল তা বলা কঠিন। কারণ শ্রীঅরবিন্দ এইরূপ গোপন-হত্যা বড় একটা সমর্থন করতেন না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় চন্দননগরের ফরাসী মেয়রকে হত্যার জন্য বারীনদা যখন শ্রীঅরবিন্দের অনুমতি চান তখন তিনি তাতে আপত্তি করেন। বারীনদা এসে একদিন শ্রীঅরবিন্দকে বললেন— "সেজদা, চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করতে চাই।"—"কেন?"—"সেখানকার স্বদেশী মিটিং ভেঙ্গে দিয়েছে এবং অনেক অত্যাচার ও পীড়ন করছে সেখানকার অধিবাসীদের ওপর।"—"সেজন্য তাকে হত্যা করতে হবে? এরূপ হত্যা তুমি কত করবে, এতে আমি মত দিতে পারি না; তাতে কোনো কাজই হবে না।"—"না সেজদা, এ না করলে অত্যাচারীদের শিক্ষা হবে না।"—"বেশ, তোমার যদি তাই মত হয়, কর।" বারীনদা ফিরে এসে বাইরে অপেক্ষমান কয়েকটি ছেলেকে বললেন—"সেজদার মত করিয়েছি।"

এদিকে কলকাতায় কিংসফোর্ডের জীবন সঙ্কটাপন্ন বুঝতে পেরে কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলকাতা থেকে সরিয়ে মজঃফরপুরে বদলি করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী বারীনদার কাছ থেকে বোমা নিয়ে অবিনাশ ভট্টাচার্যের কাছে যান। পূর্ব ব্যবস্থা মতো তিনি তাঁদের দুইটি উৎকৃষ্ট পরীক্ষিত রিভলভার দেন। অবিনাশবাবুর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে তাঁরা উভয়ে তাঁদের গন্তব্যপথে যাত্রা করেন।

সেই সময় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় তাঁর দৈনিক "নবশক্তি" বন্ধ ক'রে দেওয়ার মনস্থ ক'রেছেন। এই খবর জানতে পেরে অবিনাশবাবু

শ্রীঅরবিন্দকে বললেন, যদি তিনি তাঁকে অনুমতি দেন তবে মনোরঞ্জনবাবুকে বুঝিয়ে তিনি নবশক্তির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ সানন্দে অবিদাকে অনুমতি দিলেন। অবিদা পরের দিনই মনোরঞ্জনবাবুর গিরিডির বাড়ীতে রওনা হ'য়ে যান এবং নবশক্তির ভার তাঁর উপর দিতে মনোরঞ্জন-বাবুকে অনুরোধ করেন। প্রেসটা তিনি বিক্রি করে দেওয়াই স্থির করেছিলেন অবিদার কথা শুনে মনোরঞ্জনবাবু খুব খুশী হ'য়ে বললেন—"প্রেসটেস সব-কিছু তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি যদি তুমি "নবশক্তি" বাঁচাতে পার।" অবিদা বললেন—"আপনাকে দিয়ে দিতে হবে না প্রেস এবং নবশক্তির সমস্ত-কিছুই আপনার থাকবে, আমি খালি চালাব, সম্পাদক আপনিই থাকবেন। কিন্তু চার হাজার টাকা চাই প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য, আর কখনও কিছু আপনাকে দিতে হবে না।" মনোরঞ্জনবাবু একটু চিন্তা করে বললেন—বেশ, আমার এই শেষ সম্বলটুকু তোমার হাতে দিয়ে দিলাম।" শেষ-সংখ্যা "নবশক্তিতে" এই মর্মে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য নবশক্তির পরিচালন-ভার গ্রহণ করলেন এবং ছু'সপ্তাহ কাগজ বন্ধ থাকবে নূতন ব্যবস্থাদির জন্য। ছু' সপ্তাহ পরে নবশক্তি নবকলেবরে আবার বার হবে, ইত্যাদি। এই মর্মে অনেক হ্যাণ্ডবিলও বিলি করা হ'য়েছিল।

অবিদা গিরিডি থেকে ফিরে এলে শ্রীঅরবিন্দ সেই "নবশক্তি" পরিচালনার ভার গ্রহণের জন্য স্কট লেনের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে সবাইকে নিয়ে গ্রে ষ্ট্রীটে "নবশক্তি র আপিস-বাড়ীতে উঠে আসেন এবং সেখান থেকেই তিনি বন্দেমাতরম্ অফিসে যাতায়াত ক'রতে থাকেন। এর ছু'সপ্তাহ পূর্ণ হবার আগেই (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল) মজঃফরপুরে বোমা ফাটে। কিন্তু যে শকটের উপর বোমা ফেলা হয় তাতে ছিলেন স্থানীয় উকিল কেনেডি সাহেবের পত্নী ও কন্যা। বোমা বিস্ফোরণের ফলে উভয়েরই জীবননাশ ঘটে। কিংস্‌ফোর্ডের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। বীর কর্মীদ্বয় যখন জানতে পারলেন যে তাঁদের অমন সজাগ চেষ্টাও বিফল হ'ল এবং তাঁদের কর্মের ফলে ছুইজন নিরপরাধ ইংরাজ রমণী প্রাণ হারালেন তখন তাঁদের ক্ষোভের অন্ত রইল না। কিন্তু তাঁদের আত্মগোপনের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ঘটনাস্থল হ'তে প্রায় ২৪ মাইল দূরে ক্ষুদিরাম ধৃত হন। ২রা মে মোকামাঘাট ষ্টেশনে পুলিশ প্রফুল্ল চাকীকে যখন ধরবার চেষ্টা করে তখন বীর শহীদ পর-পর ছুইবার গুলি ক'রে আত্মহনন করেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। নির্ভীক বীর হাসিমুখে নিজের গলায় ফাঁসি তুলে নেয়। দেশমাতৃকার চরণ-বেদীমূলে প্রথম বলিরূপে

জীবনাহুতি দিয়ে এই দুইটি বঙ্গ-সন্তান বাংলার গৌরবকে ভারত-ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন।

১লা মে রাত্রি ৮টার সময় অবিদা ৫টা রাইফেল ও ৫ বস্তা কার্তুজ নিয়ে এসে নীচের একটা ঘরে রাখেন। পূর্বেই এগুলো ডেলিভারি নেবার কথা ছিল ব'লে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ে আসেন। এখন ওগুলোকে সেদিন রাত্রের মধ্যেই কোথাও সরাতে হবে। কোথায় সরাবেন তা শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য অবিদা খুব উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত্রি দশটার সময় শ্রীঅরবিন্দ যখন 'বন্দেমাতরম' অফিস থেকে ফিরে এলেন অবিদা তখন তাঁকে সব কথা বললেন, পরদিন সকালেই যে তাঁদের গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা আছে তা-ও তিনি জানালেন। কারণ সেইদিন বিকেল বেলায় অবিদা লালবাজার পুলিশ কোর্ট অঞ্চলে গিয়েছিলেন—মজঃফরপুরে বোমা ফাটার ব্যাপারে ঐ অঞ্চলে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'য়েছে তার হালচাল জানতে। তিনি যা বুঝতে পেরেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দকে তা জানালেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন বললেন—"এখনই বাগানে যাও, বারীকে বলো এ সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যেতে এবং বাগানে যেসব ছেলেরা আছে তাদের এই রাত্রেই অন্যত্র সরিয়ে দিতে। অবিদা বাগানে গিয়ে বারীনদাকে এবং আরও ৬ জন কর্মীকে নিয়ে এলেন। তাঁরা তখনই ঐসব জিনিস নিয়ে উধাও হ'য়ে গেলেন।

পরের দিন (১৯০৮ খ্রী: ২রা মে) অতি প্রত্যূষ কাল, পূর্বগগনে সূর্যের রক্তিমরাগ তখনও ফুটে ওঠেনি, শ্রীঅরবিন্দ তখনও যোগনিদ্রামগ্ন, এমন সময় পুলিশ এসে তাঁর গ্রে ষ্ট্রীটের বাসাবাড়ী ঘেরাও করলো এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে শ্রীঅরবিন্দকে জাগিয়ে তুলে যথারীতি তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ শ্রীঅরবিন্দের কোমরে দড়ি বাঁধে। মডারেট নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বোস শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির হন এবং শ্রীঅরবিন্দের ঐ অবস্থা দেখে যখন সে বিষয়ে প্রতিবাদ করেন তখন তাঁর কোমরের দড়ি খুলে নেওয়া হয়।

এইখানেই শ্রীঅরবিন্দের জীবন-নাট্যের একটি অঙ্কের যবনিকাপাত হয়। গ্রেপ্তার ক'রে পুলিস প্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে লালবাজার থানায় নিয়ে যায়, এবং পরে আলিপুর জেলে। ১৯০৮ খ্রী: ৫ই মে তিনি আলিপুর-জেলে বিচারের আসামীরূপে বন্দী হন, সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্ত এবং সেসন্স আদালতের বিচারকালে তিনি এক বৎসরকাল আবদ্ধ থাকেন; প্রথমতঃ কিছুদিনের জন্য

একটি নির্জন সেলে (ক্ষুদ্রকক্ষ) তাঁকে বন্দী থাকতে হয়, কিন্তু পরে তিনি উক্ত মামলার অপর বন্দীদিগের সহিত জেলের একটি প্রশস্ত কক্ষে একসঙ্গে থাকবার সুযোগ পান। এর পরে জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই যখন নিহত হয় (১৯০৮ খ্রীঃ, ৩১শে আগষ্ট প্রাতঃকালে ৭॥০-৮টার মধ্যে নরেন গোঁসাই নিহত হয়। ১০ই নভেম্বর কানাই দত্তের ফাঁসি হয়) তখন সমস্ত বন্দীকে পৃথক পৃথক জেলে আবদ্ধ রাখা হয়, এবং তখন থেকে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং বাক্যালাপে বঞ্চিত হন, কেবলমাত্র বিচারের সময় আদালতে এবং দৈনিক হাজিরার সময় জেলের বাইরে তাঁরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হতেন, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পেতেন না। জেলে, দ্বিতীয়বারে, যখন শ্রীঅরবিন্দ সকলের সহিত একটি বড় কক্ষে ছিলেন সেই সময় তিনি তাঁর সঙ্গী বন্দীদের সংস্পর্শে আসেন। কারাগারে অধিকাংশ সময়ই তিনি গীতা উপনিষদ পাঠে, গভীর ধ্যানে এবং যোগ-সাধনায় মগ্ন থাকতেন ; সকলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার সময়েও তিনি ঐ নিয়মে চলতেন , যখন একা থাকবার তাঁর কোনো সুযোগই ছিল না তখন, সাধারণ আলাপ-আলোচনা, খেলা-ধূলা এবং হাসি-তামাসা ইত্যাদি হট্টগোলের মাঝেও তিনি ধ্যানে নিমজ্জিত থাকা অভ্যাস করেছিলেন।

এই সময় ভাটপাড়ার মহামান্য পঞ্চানন তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও ধৃত হ'য়ে সকলকার সঙ্গে জেলে ছিলেন। অবিনাশ ভট্টাচার্য একদিন উপনিষদের কোনো একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেবার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে বলেন। শ্রীঅরবিন্দ সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা অতি সহজ-সরলভাবে অবিদাকে বুঝিয়ে দেন। অবিদা সেই ব্যাখ্যার বিষয় তর্কচূড়ামণি মশায়কে যখন জানালেন তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ব'ল্লেন—"অবিনাশ, বাবা, আমি তোমায় অতো সহজে বুঝাতে পারতাম না, অরবিন্দবাবু যেমন সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।"....সংস্কৃত ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের পাণ্ডিত্য এবং গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তর্কচূড়ামণি মহাশয় মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। জেলে তিনি যুবকদের যোগতপ ধ্যান-ধারণার বিষয়ে খুবই উৎসাহিত করতেন।...নির্দোষ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে কেবলমাত্র সন্দেহের উপর গ্রেপ্তার ক'রে তাঁকে মহা অসুবিধা এবং দুর্ভোগের মাঝে ফেলা হ'য়েছিল। জেলের কোনো খাদ্যই তিনি গ্রহণ করতেন না,—বাইরে থেকে বেলপাতা গঙ্গাজল আনিয়ে ঘরের বাইরে পুকুরপাড়ে ব'সে বেলা দুটোর সময় শুধু তা-ই খেতেন। কয়েকদিন পরে তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জেলে ছেলেদের জন্য বাইরে থেকে যেসব খাবার আসতো, হেমচন্দ্র সেন তা থেকে কিছু-কিছু নিয়ে লুকিয়ে রাখতেন। পরের দিন সকালে আবার সকলকে তিনি তা ভাগ ক'রে দিতেন। কোনোদিন মাঝরাত্রে কয়েকজন মিলে সেই খাবার বের ক'রে নিয়ে আসতেন এবং যাঁরা জেগে থাকতেন তাঁদের মধ্যে বিলি ক'রে দিয়ে খুব আনন্দ করতেন। একদিন ঐভাবে যখন কিছু বিস্কুট ভাগাভাগি চলছে সেই সময় টের পাওয়া গেল শ্রীঅরবিন্দ জেগে গেছেন। অবিদা তখনি তাঁর হাতে দু'চারখানা বিস্কুট গুঁজে দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ অমনি আত্মভোলা শিশুর মতো আহ্লাদ ক'রে হাসিমুখে শুয়ে প'ড়ে মুটমুট ক'রে সেই বিস্কুট খেতে লেগে গেলেন। ভক্তের ভগবান, তাই-না তিনি ভক্তের মাঝে শিশু ভোলানাথ।

জেলে প্রথম এবং তৃতীয়বার তিনি তাঁর সাধনার পূর্ণ সুযোগ পান এবং সেই সুযোগকে তিনি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান। তার ফলে তিনি জীবনে যে অমূল্য সম্পদ লাভ করেন তাতে তাঁর জীবন এবং কর্মের গতি ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

জেলের সেই অন্ধ কক্ষেই তাঁর জীবন-সাধনার ফলস্বরূপ অচিরেই তাঁর দিব্য দৃষ্টি খুলে যায়, তখন তাঁর সম্মুখে সর্ববস্তুতে মূর্ত হয়ে উঠেন ভগবান বাসুদেব স্বয়ং, 'বাসুদেব সর্বমিতি' এই সুদুর্লভ দর্শনের তিনি হন অধিকারী। তাঁর সেই দিব্য দর্শনের বিবরণ তিনি জেলমুক্ত হ'য়ে বাইরে এসে তাঁর দেশবাসীর নিকট প্রথম প্রকাশ করেন তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণে—

"...যে-জেল আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্কস্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হ'য়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হ'য়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদীদের দিকে আমি চাইলাম—চোর,

খুনী, জুয়াচোর—এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম।"

ভাগবতের উপাখ্যানে আছে—ব্রহ্মা স্বীয় শক্তিবলে কৃষ্ণ-সহচর রাখাল-বালকদের গোধন রাখালবালকসহ সমস্ত কিছুই যখন অপহরণ ক'রে নিয়ে কিছুদিনের জন্য আটক রেখে দেন। তখন ব্রহ্মার ক্ষমতার গর্বকে শিক্ষা দেবার জন্য মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়াবলে স্বয়ং সেই সব গোকুল, সেই সব রাখালবালক, এমন-কি তাদের পাঁচনবাড়ি ছাঁদন দড়িটি পর্যন্ত হ'য়ে ব্রজবাসীদের যার-যার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ব্রজবাসীরা মোটেই জানতে পারলো না যে, তাদের বালক এবং গোধন আদি ব্রহ্মা হরণ ক'রে রেখেছে। এ-যে শুধু কথার কথাই নয়, সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুতে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বিরাজ করছেন, তা শ্রীঅরবিন্দ স্বীয় জীবনে তাঁর সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিলেন।

সেসজ আদালতে বিচারের সময় বন্দীগণকে একটি বৃহৎ বন্দী-খাঁচায় আবদ্ধ রাখা হ'ত এবং সেখানে শ্রীঅরবিন্দ ঐরূপ অবস্থায় সমস্ত দিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন, বিচার বিষয়ে মোটেই মন দিতেন না এবং সাক্ষীদের কথাও কান দিয়ে শুনতেন না। তাঁর জাতীয়দলের অন্যতম সহকর্মী বিখ্যাত আইনবিদ্ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর সমগ্র প্র্যাকৃটিস্ ফেলে রেখে শ্রীঅরবিন্দকে বিচারের শাস্তি হ'তে রক্ষা করবার জন্য আসামী পক্ষ অবলম্বন ক'রে মাসের পর মাস দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। শ্রীঅরবিন্দ মোকদ্দমার বিষয় সম্পূর্ণরূপে তাঁরই উপর ছেড়ে দেন এবং সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শান্ত ভাব অবলম্বন করেন। কারণ তিনি তাঁর অন্তর্যামীর কাছ থেকে স্থির নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন যে, তিনি মুক্ত হবেন। কারণ ভগবান শ্রীঅরবিন্দকে কারাবাসে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে শাস্তি দিবার জন্য নয়, শ্রীঅরবিন্দ-জীবনে তাঁর বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যা, শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তাঁর সেই উত্তরপাড়া অভিভাষণে প্রকাশ ক'রেছিলেন।...এই সময়ের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের-জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হ'য়ে যায়। মুখ্যতঃ শ্রীঅরবিন্দ যোগ গ্রহণ ক'রেছিলেন, অধ্যাত্মশক্তি ও প্রেরণাকে এবং ভগবানের নির্দেশকে তাঁর জীবনের কর্মসমূহে নিয়োগ করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন এবং আন্তর উপলব্ধি যা ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রকে অধিকার

করছিল তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর চেতনাকে উর্ধ্বায়িত ক'রে তোলে এবং তাঁর কর্মাবলী তখন তার ফলস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়; দেশের মুক্তি এবং কার্যসমূহকে অতিক্রম ক'রে তা' এক বৃহত্তর লক্ষ্যে স্থিরীকৃত হয়, পূর্বে যার আভাসমাত্র প্রতিভাত হ'য়েছিল, তা তখন হয় বিশ্বব্যাপী এবং সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের বিধানে কার অদৃষ্টে যে কী নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আছে তা সীমিতবুদ্ধি মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দকে কারারুদ্ধ ক'রেছিল তাঁকে শাস্তি দিতে, তাঁর শক্তিকে খর্ব ক'রতে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবনে তার ফল হ'ল সম্পূর্ণ উল্‌টো। জেলে তিনি সেই সর্ব-শক্তিমানকে চাক্ষুষভাবে দর্শন ক'রে, জেল থেকে বেরিয়ে এলেন জগজ্জয়ী শক্তি নিয়ে। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং তাঁর কারা-কাহিনীতে লিখেছেন—

"অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম, উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটিরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছে যে, আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ—শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই—অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্টই হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।"

কারামুক্তি

শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৯ খ্রীঃ ৬ই মে কারামুক্ত হন। কারামুক্তির পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে মধ্যাহ্ন-আহারে তৃপ্ত করেন। তার পর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মেসোম'শায়ের (কৃষ্ণকুমার মিত্র) বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিলাভের সংবাদ পেয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখবার জন্য কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে যান। কবি তাঁদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেই কথাবার্তা বলেন। কৃষ্ণকুমারবাবু সেসময় আগ্রা জেলে বন্দী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সেবাযত্নের ভার তাঁর মাসতুতো বোন বাসন্তী দেবীর উপরেই পড়েছিল। বাসন্তী দেবী শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের নম্রতা এবং বাধ্যতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বাসন্তী দেবীর মাতাঠাকুরাণীর শরীর তখন রুগ্ন ছিল। ডাক্তার তাঁকে রোজ গঙ্গাস্নানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্নানে যাবার সময় তিনি একজন কাউকে সঙ্গে নিতেন। এবিষয়ে বাসন্তী দেবী লিখেছেন—"...আমার মা গঙ্গাস্নান করবার সময় একজন কাকেও সঙ্গে নিতেন। প্রায়ই তিনি অরোদাদাকে সঙ্গে নিতেন—আমরাও যেতাম।

"দেখেছি অরোদাদা গভীর মনোযোগের সঙ্গে 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন'-এর জন্য প্রবন্ধ লিখছেন—লেখাটি নেবার জন্য লোক অপেক্ষা করছে—এমন সময় মা এসে তাঁকে বললেন—'অরো, আমার সঙ্গে চলো তো, গঙ্গাস্নানে যাই।' তখনি অরোদাদা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না ক'রে, লেখা অসমাপ্ত রেখে—এমনকি যে বাক্যটা লিখছিলেন সেটা শেষও হয় নাই—তখনি কলমটি রেখে, মার সঙ্গে চললেন—এমনি বাধ্য তিনি ছিলেন। এমন বাধ্যতা তো আর কখনো কোথায়ও দেখি নাই।...

"তাঁকে কখনও রাগ করতে দেখি নাই। অরোদা ব'সে লিখছেন,—পায়ের চটি খোলা প'ড়ে রয়েছে। আমার মা তাঁর সেই চটিজুতা পরে ছাদে বেড়াতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন লোক অরোদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি তাঁর চটিজুতা এদিক-ওদিক খুঁজছেন, এমন সময় মাকে দেখে খুব মিষ্টি ক'রে বললেন—"ন-মাসি, তুমি কি আমার চটি পায়ে দিয়েছ? আমার সঙ্গে কয়েকজন দেখা করতে এসেছেন।" মা তখনি তাঁর চটি দিয়ে দিলেন। আমি ভাবলাম—মা তাঁর চটি পায়ে দিয়ে ছাদে চলে গেছেন,

কতক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'ল। কিন্তু এজন্য অরোদা বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হন নাই।"....

নম্রতা এবং বাধ্যতা ব্যক্তি-জীবনের একটা অতি মহৎ সম্পদ। এই দু'টি সদ্‌গুণ যদি ব্যক্তি চরিত্রে না থাকে তবে সেরকম ব্যক্তি নিয়ে আদর্শ সমাজ গঠন করা যায় না। এই সদ্‌গুণাবলী শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের জন্মার্জিত সম্পদ ছিল এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি তা অকাতরে প্রয়োগ ক'রে চলতেন। একেই বলে—"আপনি আচরি' ধর্ম জীবেরে শিখায়।"

জেল থেকে বাইরে এসে শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন দেশের সমগ্র রাজনৈতিক রূপ একেবারে বদলে গেছে। জাতীয় নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই তখন জেলে অথবা আত্মগোপন উদ্দেশ্যে অজ্ঞাতবাসে। সর্বত্রই একটা নিরুৎসাহ এবং নিরাশার ভাব বিরাজমান, যদিও দেশের জাগ্রতবোধ তখন সম্পূর্ণরূপে নিভে যায়নি—তা অবদমিত হ'য়েছিল মাত্র, এবং সেই দমনের মধ্যে দিয়েই আবার তা বেড়ে উঠেছিল। শ্রীঅরবিন্দ পুনরায় আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হ'লেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় সভার আয়োজন করলেন, কিন্তু যে সভায় পূর্বে আগ্রহান্বিতভাবে সহস্র সহস্র ব্যক্তি যোগদান ক'রত, সে-যায়গায় এখন মাত্র শতাধিক ব্যক্তির সমাবেশ হ'তে লাগলো, যাদের মধ্যে পূর্বের সে-শক্তি এবং সে-প্রাণ দেখা গেল না। বাণী প্রদানের জন্য শ্রীঅরবিন্দ কয়েকটি জেলায় পরিভ্রমণ ক'রলেন, 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' হ'চ্ছে সেই সব বাণীর অন্যতম।

শ্রীঅরবিন্দের এই উত্তরপাড়া অভিভাষণ ভারতবাসীর একটি অমূল্য সম্পদ, ভারতের অধ্যাত্ম-প্রগতির পথে তা এক অভিনব ইঙ্গিত। এটি হ'চ্ছে উত্তরপাড়ায় তাঁর দ্বিতীয় বারের অভিভাষণ। স্কট লেনের বাসায় থাকার সময় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তিনি প্রথমবার উত্তরপাড়ার সভায় যোগদান ক'রেছিলেন। সেই সভা হ'য়েছিল আলিপুর মামলার একমাস পূর্বে। বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের পুত্র মিছরীবাবুর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অমরবাবু বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে উত্তরপাড়ায় নিয়ে যান। অমরবাবু লিখেছেন—মিছরীবাবু দেশপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর জীবনে ত্যাগের দীক্ষা তখন ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসার পর তিনি সর্বস্ব পণ ক'রে, শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণও পণ ক'রেছিলেন।

দ্বিতীয় বারেও—(১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে) উত্তরপাড়ায় ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় অভিভাষণের জন্য—অমরবাবুই শ্রীঅরবিন্দকে নিমন্ত্রিত ক'রে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঞ্জীবনী আপিসের বাড়ী থেকে নিয়ে যান। নির্দিষ্ট দিনে অমরবাবু যখন ট্রেনে করে শ্রীঅরবিন্দকে উত্তরপাড়া নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শ্রীঅরবিন্দের এক অতি অপূর্ব মূর্তি অমরবাবু দর্শন করেন। তাঁর সেই প্রশান্ত এবং ধ্যানস্থ মূর্তি দেখে তিনি ট্রেনের কামরায় তাঁর সঙ্গে কোনো কথা ব'লে তাঁকে বিরক্ত করেননি। সেই অপূর্ব পরিবেশ অমরবাবুর হৃদয়-মনে এক প্রগাঢ় ভক্তি-ভাবের সৃষ্টি ক'রেছিল। যে-ট্রেনে ক'রে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরপাড়া স্টেশনে নামেন, সেই ট্রেনের প্রায় সমস্ত যাত্রীই শ্রীঅরবিন্দের ভাষণ শুনবার জন্য উত্তরপাড়া স্টেশনে নেমে পড়ে। রাজা প্যারীমোহন স্বয়ং স্টেশনে এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে অভ্যর্থনা করতে, সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মিছরীবাবুও ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে উদ্‌গ্রীব উত্তরপাড়ার নরনারীকে দর্শনের সুযোগ দেবার জন্য উত্তরপাড়ার কর্মীরা একটি সুচিন্তিত এবং সুগঠিত মিছিলের ব্যবস্থা করেন। স্টেশন থেকে, বিশ্রামের জন্য, প্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে অমরবাবুর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিশ্রাম এবং জলযোগের পর বেলা ৩টা-৪টার সময় মিছিল ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে সকলে সভাস্থলে পৌছেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের পূর্ব-প্রাঙ্গণে গঙ্গার পশ্চিমকূলে সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় বক্তা একমাত্র শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন। সারস্বত সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি ৺হরিহর মুখোপাধ্যায় রচিত এই আবাহন সঙ্গীতটি গীত হয় শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উদ্দেশ্যে :

"হে ধর্ম্ম, হে পুণ্য, নবীন বেশে এস হে,
হে মহান্, এস শান্তির মত কলহে,
এস হে সুন্দর, মিলন সম বিরহে,—
হে বিরাট, হে সংযম, আজি এস এস হে :—
বাজুক মঙ্গলশঙ্খ তব আগমনে
মুখরিত সামগান পূত তপোকাননে,
তব পদরজস্পর্শে হোক মুঞ্জরিত,
তব বাঁশরীর তানে হোক সঞ্জীবিত
নীরস জীবনকুঞ্জে নিস্পন্দ-চেতন,
এস ফিরে এ-সংসারে হারানো রতন,—
ধূপেরই মত পূত সৌরভ বিলাতে

হে বরেণ্য নবীন আশা-ভরসা সাথে,
পূর্ণ সম দৈন্যে, আলোক সম আঁধারে,
আজি অবনত ভারত চাহে তোমারে।"

মাননীয় রাজেন্দ্রনাথ (মিছরীবাবু) সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সেযুগে শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে মিছরীবাবু ছিলেন অন্যতম। সেদিনকার একটিমাত্র ঘটনায় মিছরীবাবুর অরবিন্দ-ভক্তির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন সেই সভায় প্রায় দশহাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

তখনকার দিনে আজ-কালকার মতন দূর থেকে কণ্ঠস্বর শোনাবার জন্য মাইকের ব্যবস্থা ছিল না। আর শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠস্বর ছিল অতি মৃদু, বড় জোর শতাধিক শ্রোতার কান পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্বর পৌঁছতো। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য উপস্থিত সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী একেবারে নিস্তব্ধ। তাঁর কথা সকলে শুনতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না তা' বুঝবার উপায় ছিল না, কিন্তু "সভায় ছিল একেবারে মৃতের স্তব্ধতা।" লিখেছেন প্রত্যক্ষদর্শী অমরবাবু।

সভার আয়োজনের ভার ছিল মিছরীবাবুর উপর। সভার সাজসজ্জা ইত্যাদি সমস্ত আয়োজন তিনি উত্তরপাড়া কর্মীদের সহায়তায় অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রেছিলেন, যুবক-কর্মীরাও তাঁর আদেশ বর্ণে-বর্ণে পালন ক'রেছিলেন। সেই সভার অপূর্ব শোভা সেদিন দর্শকমণ্ডলীর নয়ন-মনকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভ'রে দিয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দকে যেভাবে মাল্যভূষিত করা হ'য়েছিল তা-ও স্মরণীয়—পা পর্যন্ত লম্বমান যুঁই ফুলের গ'ড়ে মালা। মিছরীবাবু তাঁর মনোমত ক'রেই বায়না দিয়ে সে-মালা তৈরী করিয়েছিলেন। কারণ এ-তো শুধু তাঁর একজন দেশনেতার সম্বর্ধনাই নয়, এ-যে তাঁর দেবতাপূজার আয়োজন। সন্ধ্যার পর রাত্রি প্রায় আটটার সময় সভা শেষ হয়। সভার পর শ্রীঅরবিন্দ যখন তাঁর গলার মালাগাছা টেবিলের উপর রেখে গঙ্গার ধারে রাজবাড়ীতে যাবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় কোনো সন্ধানী সেই মালাগাছা আত্মসাৎ করে। মিছরীবাবু যখন তা টের পেলেন তখন তাঁর মূর্তি একেবারে অগ্নিশর্মা! সে মূর্তি দেখে মানুষকে ভীত হ'তেই হয়। প্রথমে স্বেচ্ছাসেবকদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করার পর তিনি বললেন—"আমার বাটীর নারায়ণের গলার পৈতা যদি কেউ খুলে নিত তাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ হ'ত না কিন্তু এ-কাজে আমার ক্ষোভের অন্ত নাই।" অমরবাবু তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করবার জন্য বললেন—"যে নিয়েছে সে লোভেই নিয়েছে, অরবিন্দের গলার মালা নিতে কার না লোভ হ'তে পারে।" পরদিন প্রাতঃকালে মালা পাওয়া

যায়, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গ-স্পর্শে মিছরীবাবুর সে ক্রোধ একেবারে জল হ'য়ে গেছে। তিনি মালাচোরকে বললেন—"যাও, ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করগে। আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।" সে-ব্যক্তি অবাক হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দের পায়ের তলায় মাথা নুইয়ে ক্ষমা চাইলো।

শ্রীঅরবিন্দকে সে-যুগেই যাঁরা চিনেছিলেন, ধন্য তাঁদের ভাগ্য, সার্থক তাঁদের জন্ম।

সেই সময় তিনি যে দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন,—একটি ইংরাজি—'কর্ম্মযোগীন্' এবং অপরটি বাংলা—'ধর্ম্ম'—তারও প্রচার ক্রমেই অধিকসংখ্যক হ'য়েছিল এবং 'বন্দেমাতরমে'রই মতো তা হ'য়েছিল স্বাবলম্বী।

১৯০৯ খ্রীঃ শ্রীঅরবিন্দ বরিশাল প্রাদেশিক সভায় যোগদান করেন এবং সেখানে বক্তৃতা দেন, কারণ আপস মীমাংসার ফলে বাংলাদেশে দুইটি দল পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েনি, সুতরাং উভয় দলই উক্ত সভায় যোগদান করে।

শ্রীঅরবিন্দ কখনই ইংরাজের ছল-চাতুরীপূর্ণ কোনো রকমের পরিবর্ত্তন-ব্যবস্থায় (হোমরুল ইত্যাদি) রাজী ছিলেন না—যে বস্তু তখনকার সব গবর্ণমেণ্টই ভারতকে দিতে প্রস্তুত ছিল। তিনি সর্ব্বদাই 'নো কম্প্রোমাইজ' (কোনো আপস-রফা. নহে) নীতিকে ধরে ছিলেন, 'নো কো-অপারেশন উইদাউট কনট্রোল' (আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ব্যতীত কোনো সহযোগ নহে) যে বিষয় তিনি সে সময়ে 'কর্ম্মযোগীন-এ 'ওপন লেটার টু মাই কান্ট্রিমেন' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। গভর্ণমেণ্ট যদি দেশ পরিচালনা ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা মনোনীত দেশের গণ্যমান্য মন্ত্রীদের হাতে অর্থনৈতিক অধিকার অর্পণ করতে রাজী হ'ত তবেই তিনি, ব্রিটিশ ভারতবাসীকে যা দিতে চায়, সে বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তার কোনো লক্ষণই তখন দেখা যায় নি যে পর্য্যন্ত না মণ্টেগু রিফর্ম্মের কথা ওঠে, যাতে ঐধরণের কিছুটা আভাস ছিল। শ্রীঅরবিন্দের এরূপ ভবিষ্যৎদর্শন হয়েছিল যাতে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অর্দ্ধপথে ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার দাবীর বিষয়ে মনোযোগী হবে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তটি সত্য সত্যই দেখা দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি ধারণা করতে পারেন নি যে, তা কোন্ সময়ে আসবে। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী প্রস্থানের ন'বছর পরে 'মণ্টেগু রিফর্ম্ম' এসেছিল, কিন্তু তখন তিনি বহির্জ্জগতের সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে অধ্যাত্ম সাধনায় রত ছিলেন এবং অধ্যাত্মশক্তির সহায়েই

তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সাহায্য করে চলেছিলেন, যে পর্য্যন্ত ন
ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সত্যকারের আলোচনার সময়
পূর্ণ হয়েছিল যা ব্রিটিশের ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রেরণ এবং পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহে
পর্য্যবসিত হয়।

কিন্তু দেশের নেতৃবৃন্দ তখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে—শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে
তাঁদের দৃষ্টি তখনও অন্ধ। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ফল পুরামাত্রায়
গ্রহণ করা তখন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না—ক্রীপস্-প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখ্যান
করলেন শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ সত্ত্বেও। ক্রীপস্-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের
ফলেই হ'ল ভারত বিভাগ এবং ভারতবাসীর চরম দুঃখ-দুর্দশা ও
দুর্ভোগ।

চন্দননগরে আত্মগোপন

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। কারণ তখন শ্রীঅরবিন্দই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের দমননীতি চালাবার বিরুদ্ধে মস্ত বড় বাধা। আলিপুর-বিচারে তারা শ্রীঅরবিন্দকে আন্দামানে পাঠানোর বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁকে নির্ব্বাসনে পাঠাবার মতলব করেছিল। ব্রিটিশের সেই উদ্দেশ্যের বিষয় সিষ্টার নিবেদিতা জানতে পারেন এবং তিনি শ্রীঅরবিন্দকে পরামর্শ দেন : ব্রিটিশ-ভারত ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়ে তাঁর কাজ চালাতে, তা হলে কেউ তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না বা একেবারে বন্ধ করতে পারবে না। শ্রীঅরবিন্দ ব্রিটিশের নির্ব্বাসন দণ্ড-নীতির (ডিপোর্টেশন) বিরুদ্ধে তখন কর্ম্মযোগীন-এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন, যেটিকে তিনি 'দেশবাসীর প্রতি তাঁর শেষ ইচ্ছা' নাম দিয়েছিলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ওর দ্বারাই তিনি ব্রিটিশের উক্ত নীতিকে (ডিপোর্টেশন) ঘায়েল করতে পারবেন, এবং সত্য সত্যই তাতে সেই রকম ফলই ফললো—ডিপোর্টেশন নীতি ব্রিটিশকে পরিত্যাগ করতে হল, তখন থেকে কাকেও গ্রেপ্তার করতে হলে তার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টকে কোনও রাজদ্রোহমূলক অপরাধের সুযোগ অন্বেষণের জন্য অপেক্ষা করতে হোত। শ্রীঅরবিন্দের বেলায় সে সুযোগ তাদের মিললো, যখন শ্রীঅরবিন্দ ঐ কর্ম্মযোগীন-এ নিজ স্বাক্ষরে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়ে মন্তব্য করে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধটির সুর যথেষ্ট সংযত এবং ভদ্র ছিল এবং হাইকোর্টের বিচারে সেটা রাজদ্রোহমূলক নয় বলে প্রমাণ হয় এবং পত্রিকার প্রিণ্টারকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯১০ সাল, ২১শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর কর্ম্মযোগীন অফিসে শ্রীঅরবিন্দ জানতে পারলেন যে, গভর্ণমেণ্ট সংকল্প করেছে তাঁর অফিস অনুসন্ধান করতে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। এই খবর পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ বিষয়ে যখন চিন্তা করছিলেন তখন হঠাৎ উপর থেকে তাঁর প্রতি আদেশ এল : ফরাসী-ভারত চন্দননগরে চলে যাবার। শ্রীঅরবিন্দ তৎক্ষণাৎ সেই উর্দ্ধলোকের আদেশ পালন করলেন, কারণ তখন একমাত্র ভগবৎ-নির্দ্দেশে জীবন পথে চলাই তাঁর জীবনের মুখ্য ব্রত হয়েছিল। সুতরাং তখন সে-আদেশ অমান্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি আর কারো সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করবার জন্য অপেক্ষা না করে, ৪নং শ্যামপুকুর লেনের বাড়ী হতে অন্তর্হিত হয়ে দশ

মিনিটের মধ্যে ভ'গীরথী তীরে গিয়ে পৌছলেন। তাঁর সঙ্গে যান সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং বীরেন বোস। তাঁরা একটা নৌকা ভাড়া ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চন্দননগরে গিয়ে পৌছেন। সেখানে শ্রীঅরবিন্দকে মতিলাল রায় মহাশয়ের জিম্মায় রেখে তাঁরা উভয়ে রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই নৌকাতে ক'রে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন চন্দননগরে অজ্ঞাতবাসে কাল কাটাতে লাগলেন। তিনি সিষ্টার নিবেদিতার কাছে এক পত্রে নির্দ্দেশ পাঠালেন: তাঁর অনুপস্থিতকালে 'কর্ম্মযোগীন'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে। দু'টি পত্রিকার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ যোগ এইবার শেষ হ'য়ে গেল।

পণ্ডিচেরী প্রয়াণ

চন্দননগরে, সকল প্রকারের কর্ম থেকে সংস্রবমুক্ত হ'য়ে, তিনি নির্জনে সম্পূর্ণরূপে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে রইলেন। এইভাবে মাসাধিককাল অতিবাহিত হবার পর একদিন তাঁর অন্তঃপুরুষের কাছ থেকে আদেশ এল পণ্ডিচেরী প্রয়াণের।

চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরী রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থাদি করা হ'য়েছিল, শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রকুমার গুহরায় মহাশয় তাঁর 'দেবতা-বিদায়' প্রবন্ধে সে বিষয়ে যা লিখেছেন তার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

পণ্ডিচেরী প্রস্থানের নির্দেশ পাওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মাসতুতো-ভাই সুকুমার মিত্র মহাশয়কে এক পত্রে লিখে পাঠান যে, তাঁকে যেন শিগগির ব্রিটিশ ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বাসস্থান নির্বাচন, জলপথে কি স্থলপথে গমন, যাত্রার দিন নির্ধারণ, চন্দননগর থেকে শ্রীঅরবিন্দকে কলকাতায় কী ভাবে আনা হবে এবং অর্থ-সংগ্রহ ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সুকুমার বাবুর উপরেই ন্যস্ত হ'য়েছিল। তিনি একাই ভেবে-চিন্তে সব পরিকল্পনা স্থির ক'রেছিলেন এবং সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবার জন্য সবরকম সতর্কতামূলক উপায়ও তিনি অবলম্বন ক'রেছিলেন। সুকুমারবাবু তখন যুবক হ'লেও বয়সের তুলনায় তাঁর যথেষ্ট গাম্ভীর্য ছিল। তিনি তখন পুলিশের নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তা সত্ত্বেও গোয়েন্দা-পুলিশের প্রায় ৬।৭ জন গুপ্তচরের সতর্ক দৃষ্টিকে এড়িয়ে তাঁর উপর ন্যস্ত তাঁর অরোদা'র সেই সুকঠিন কাজটি তিনি অতি দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন ক'রেছিলেন।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন সুকুমারবাবু নগেন্দ্রকুমার গুহরায় মহাশয়কে 'সঞ্জীবনী' অফিসের একটি কক্ষে দুটো ট্রাঙ্ক দেখিয়ে বললেন, ঐ ট্রাঙ্ক-দুটো যেন নগেনবাবু তাঁর মেসে নিয়ে গিয়ে রাখেন। নগেনবাবু ট্রাঙ্ক-দুটোকে একটু তুলে ধ'রে বুঝতে পারলেন যে, তাতে জিনিস পত্র ভর্তি আছে। নগেনবাবু তাঁর সুকুমার-দাকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওতে বোমা-পিস্তল আছে নাকি?" উত্তরে সুকুমারবাবু তাঁকে বললেন, ওতে যা-ই থাক্, ও-বাক্স দুটো যেন নগেনবাবু তাঁর কাছেই রাখেন। অতঃপর ট্রাঙ্ক-দুটোকে নগেনবাবু ৪৪।১নং কলেজ স্ট্রীটে তাঁর মেসে স্থানান্তরিত করলেন। সুকুমারবাবু তাঁকে পরের দিন নির্ধারিত সময়ে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে বললেন।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে নগেনবাবু যখন সুকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন, তখন সুকুমারবাবু তাঁকে দুইজন ব্যক্তির নামধাম লিখে দিলেন এবং তাঁর হাতে আবশ্যক মতো টাকা দিয়ে তাঁকে কলোম্বোগামী জাহাজের দু'খানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে আনতে বললেন। গন্তব্যস্থল পণ্ডিচেরীর টিকিট না কিনিয়ে সুকুমারবাবু একেবারে কলোম্বোরই টিকিট কিনিয়েছিলেন। সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই এরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ এতে তদন্তের সময়ে পুলিশের দৃষ্টি প্রথমটায় কলোম্বোর দিকেই পড়বে। নগেনবাবু লিখেছেন—"জাহাজ কোম্পানীর নাম আমার মনে নাই, কিন্তু সুকুমার-দার আজ পর্য্যন্ত তাহা মনে আছে—সেই কোম্পানীর নাম হইল—Messageries Martime. তবে যে-জাহাজে দেবতা-বিদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই জাহাজের নাম আমি ভুলি নাই! ইডেন গার্ডেনের সন্নিকটে গঙ্গা-বক্ষে ভাসমান সেই 'দ্যুপ্লে' (Duplex) জাহাজখানা আজও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে।"

সুকুমারবাবুর নির্দেশ মতো টিকিট কেনার সময় নগেনবাবু জাহাজ-কর্তৃপক্ষকে ব'লে টু-সিটেড্ (দু'জন যাত্রীর মতো) একটি ক্যাবিন রিজার্ভ করেন। টিকিট কেনা এবং ক্যাবিন ঠিক করার পর নগেনবাবু সঞ্জীবনী অফিসে গিয়ে সুকুমার বাবুকে উদ্বৃত্ত টাকা ফেরৎ দিলেন। টিকিট দু'খানা দেখে নিয়ে সুকুমার বাবু সেই টিকিট আবার নগেনবাবুর হাতে দিয়ে তাঁর কাছেই রেখে দিতে বললেন।

সুকুমারবাবু ৩১শে মার্চ তারিখে সকালের দিকে নগেনবাবুকে ডেকে এনে বললেন—"আজ দুপুরে তুমি আর সুরেন বাগবাজারের ঘাট থেকে একটা নৌকা ক'রে গঙ্গার ওপারে যাবে। ট্রাঙ্ক-দুটো এখনই নিয়ে গিয়ে জাহাজের কেবিনে রেখে আসবে। টিকিট দু'খানা সঙ্গে নিয়ে যেও। গঙ্গার ওপারের ঘাটে একখানা নৌকা থেকে দু'জন লোক তোমাদের নৌকায় উঠবেন তুমি তাঁদের কলোম্বোর জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে।"

শ্রীঅরবিন্দকে এবং তাঁর সহযাত্রী বিজয় নাগকে চন্দননগর থেকে উত্তর পাড়ার ঘাটে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন শ্রীযুত মতিলাল রায় সেখানে নৌকা পরিবর্তন ক'রে চাঁদপাল ঘাটে পৌছবার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হ'য়েছিল। বাগবাজার ঘাট থেকে নৌকা নিয়ে উত্তরপাড়া ঘাটে পৌছতে নগেনবাবুর কিছু দেরি হ'য়ে গিয়েছিল, সুতরাং সেখানে পৌছে নগেনবাবু শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান না পেয়ে সঞ্জীবনী কার্য্যালয়ে ফিরে যান। তার পূর্বেই

শ্রীঅরবিন্দের নৌকা উত্তরপাড়াঘাট থেকে চাঁদপালঘাটের দিকে রওয়ানা হ'য়ে যায়। উত্তরপাড়া থেকে নৌকা ভাড়া ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে চাঁদপালঘাটে পৌঁছে দেবার ভার প'ড়েছিল অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅরবিন্দ-ভক্ত মিছরীবাবুও (শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী রওয়ানা হবার সংবাদ জানতেন।

গঙ্গার পরপারে নির্দিষ্ট ঘাটে শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে না পেয়ে যখন নগেনবাবু সঞ্জীবনী কার্যালয়ে ফিরে এসে সুকুমারবাবুকে সংবাদ জানালেন, সুকুমারবাবু তৎক্ষণাৎ নগেনবাবুকে চাঁদপালঘাটে পাঠালেন জাহাজে শ্রীঅরবিন্দের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাবিন থেকে ট্রাঙ্ক-দুটো উঠিয়ে নিয়ে আসতে। সুকুমারবাবুর নির্দেশ মতো নগেনবাবু আবার চাঁদপালঘাটের দিকে ছুটলেন। তিনি জাহাজে গিয়ে শুনলেন যে, ডাক্তার এসে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক'রে চলে গেছে। এই খবরে নগেনবাবুর মনটা খুবই দমে গেল, তিনি ভাবলেন, এত পরিশ্রমের পর সব চেষ্টাই বুঝি-বা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। অগত্যা তিনি জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা ক'রে ডাক্তারের বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিলেন। কারণ সেইদিন রাত্রি এগারটার মধ্যে ডাক্তারকে ফিজ দিয়ে তাঁর বাড়ী থেকে দু'জন যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে সার্টিফিকেট আনতে হবে। নচেৎ ভোরের জাহাজে তাঁদের পণ্ডিচেরী পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে না। যে-কুলিটাকে দিয়ে ক্যাবিন থেকে ট্রাঙ্ক-দুটো উঠিয়ে আনা হ'ল, সেই কুলিটা নগেনবাবুকে বললো যে, সে ডাক্তার-সাহেবের বাড়ী চেনে। ডাক্তারটি ছিলেন ইউরোপীয়ান। কুলিটা বললো যে, সাহেবের বেয়ারার সঙ্গেও তার খুব আলাপ আছে, সুতরাং তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে সে সবকাজ ঠিক ক'রে দেবে। কুলিটা ছিল বাঙ্গালী। নগেনবাবু কুলির কথায় অনেকটা ভরসা পেলেন এবং তার চাহিদা মতো তাকে দশটাকা দিতে রাজী হ'য়ে তাকে ঘাটের ধারে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে, ট্রাঙ্ক-দুটো সঙ্গে নিয়ে একটা গাড়ী ক'রে তিনি তাঁর মেসে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে অমরবাবু শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে চাঁদপালঘাটে পৌঁছে সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে একটি দরজাওয়ালা ঘোড়ারগাড়ী ভাড়া ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে ও বিজয় নাগকে সেই গাড়ীতে বসিয়ে, গাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে রেখে সুকুমারবাবুর বাড়ীর দিকে ছুটলেন তাঁদের সন্ধানে। এর পরের ঘটনা নগেনবাবু যা লিখেছেন তা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম—

"ট্রাঙ্ক দুইটা লইয়া যখন মেসে পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুলিটাকে ঘাটে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আসিয়াছি। ছুটিলাম আবার সুকুমার-দার বাড়ীর দিকে। আমার মেস আর সঞ্জীবনী কার্য্যালয় খুব বেশী হইলেও ৮৷১০ মিনিটের পথ। বাহিরের ঘরে তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। জাহাজের ক্যাবিন হইতে মাল উঠাইয়া আনার খবর তাঁহাকে জানাইলাম। আনুষঙ্গিক অন্যান্য সংবাদ বলিবার পূর্বেই তিনি নির্দেশ দিলেন,—তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক দুইটা ও টিকেট দুইখানি লইয়া আবার জাহজেঘাটে চলিয়া যাইতে। সেখানে অমরবাবু, অরবিন্দ ও বিজয় নাগকে গাড়ীতে করিয়া লইরা গিয়াছেন। তাঁহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। জাহাজের ডাক্তার যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে-খবরও তিনি অমরদার প্রেরিত লোকের কাছে ইতিমধ্যেই শুনিয়াছেন। ডাক্তারকে দিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট আনিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা জানাইয়া প্রয়োজনীয় টাকা চাহিতেই তিনি বাড়ীর ভিতরে গিয়া টাকা আনিয়া দিলেন।

"মনে হইল 'পলাতক' শ্রীঅরবিন্দের সন্ধানে তৎপর বাংলার গোয়েন্দা পুলিশ-বাহিনীর সদা-সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরী পাঠাইয়া দিবার যে গোপন অভিযান, তাহা পরিচালনা করিতেছেন সুকুমার-দা। 'সঞ্জীবনী' কার্যালয় হইল অধিনায়কের শিবির। সেখানে বসিয়া তিনি হুকুম দিতেছেন, আমরা নিয়মী আজ্ঞাবহ বিশ্বস্ত সৈনিকের মত তাহা নির্বিচারে তামিল করিয়া যাইতেছি।

"মেস হইতে ট্রাঙ্ক দুইটা একটা ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া টিকেট দুইখানি সঙ্গে করিয়া ছুটিলাম আবার চাঁদপাল ঘাটের দিকে। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাই রাস্তার পার্শ্বে অরবিন্দের গাড়ী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেই কুলিটা নিকটেই বসিয়া আছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—'তোমার বাবুরা এসে গেছে। আমি তোমার কথা ব'লে রেখে দিয়েছি। রাত হ'য়ে গেল, আর দেরী হ'লে কিন্তু সাহেবকে পাওয়া যাবে না, ঘুমিয়ে পড়বে।'......

"আমার গাড়ীখানা বিদায় দিলাম, কুলি ট্রাঙ্ক দুইটা অরবিন্দের গাড়ীর ছাদে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে রাখিয়া দিল। গাড়ীখানা ছিল দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর। ওই শ্রেণীর গাড়ীগুলির গড়ন পালকির মতন বলিয়া জানালা বন্ধ করিলে বাহির হইতে ভিতরের আরোহীকে চেনা যায় না। সেই জন্যই

প্রথম শ্রেণীর ফিটন্ গাড়ী ভাড়া করা হয় নাই। আমি গাড়ীতে উঠিয়া অমরদার পাশে বসিলাম। আমাদের দুইজনের আসন ছিল সামনের দিকে। আর অরবিন্দ ও বিজয় নাগ বসিয়াছিলেন পিছনের দিকে। কুলিটা উঠিয়া বসিল কোচমানের পাশে। ডাক্তারের বাড়ী ছিল যে রাস্তায় উহার নাম মনে পড়িতেছে না; তবে চৌরঙ্গীর ও-দিকে সাহেব-পাড়ায়, এইটুকু মাত্র স্মরণ আছে।

"ডাক্তারের বাড়ী পৌঁছিয়া আমরা চারিজন বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলাম। কুলিটাই বেয়ারাকে ডাকিয়া লইয়া সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিল। সাহেব অরবিন্দ ও বিজয় নাগকে ডাকিয়া পাঠাইবার পূর্বেই আমি তাঁহাদের টিকিট দুইখানি দিলাম এবং কি নাম-ঠিকানা দিয়া টিকিট করা হইয়াছে তাহাও বলিলাম। ডাক্তারের ফিজ-এর টাকা অরবিন্দের হাতে দিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। কত টাকা ফিজ্ দিতে হইয়াছিল, তাহা ঠিক স্মরণ নাই, সম্ভবতঃ বত্রিশ টাকা।

"একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সুকুমার-দার মুখে শুনিয়াছি অরবিন্দ স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি ম্যালেরিয়া রোগীর ভেক ধরিয়া জাহাজে উঠিবেন এবং চিকিৎসকের উপদেশ মতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সমুদ্র যাত্রায় যাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিবেন। জাহাজের ক্যাপটেনকেও আমি সুকুমার-দার নির্দেশ মতো জানাইয়া ছিলাম, যাত্রী একজন ম্যালেরিয়া রোগী, নৌকাতে আসিয়া জাহাজে উঠিবেন। পরীক্ষার সার্টিফিকেট লইবার কালে ডাক্তারের প্রশ্নোত্তরে অরবিন্দ অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া বিজয় নাগের মুখে শুনিয়াছি।

"অরবিন্দ ও বিজয় নাগকে ডাক্তার ভিতরে ডাকাইয়া নিবার পূর্বে আমাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল প্রায় আধঘণ্টা কাল। ইতিমধ্যে কুলিটা যে একটা মজার কাণ্ড করিয়া বসিল, তাহা আমরা সকলেই উপভোগ করিলাম। কুলিটা আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া চুপি-চুপি বলিল—'তোমার ওই বড়বাবুটা ভয় পেল নাকি? সাহেব-সুবার কাছে আর যায়নি বুঝি? বলে দেও না, সাহেব ভাল লোক, কিছু ভয় নেই।' কুলি আমাদের তিনজনকে মাঝে-মাঝে কথা বলিতে দেখিয়াছে। কিন্তু অরবিন্দকে একেবারে চুপচাপ দেখিয়াই সম্ভবত তাহার ওইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। আমি বলিলাম,—'না রে, ভয় পাবে কেন? ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে কিনা, শরীর খারাপ, তাই ও রকম দেখছিস।' কুলি আমার কথা

বুঝিতে পাইল না। চোখের পলকে অরবিন্দের সামনে যাইয়া আস্তে আস্তে বলিল,—'ভয় পাচ্ছ কেন বাবু? সাহেব বড় ভাল লোক। তোমার কিছু ভয় নেই।' বলিয়াই দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার তুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিল, যেন তাঁহাকে সজাগ ও সচেতন করিয়া তুলিতেছে। আমরা তিনজনেই পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিলাম, অরবিন্দও মৃত্যু হাসিলেন। চলচ্চিত্রের মতো সে-দৃশ্য আজও আমার মানসপটে প্রতিফলিত হইতেছে।

"ইহার খানিকক্ষণ পরেই বেয়ারা আসিয়া জানাইল,—

'সাহেব সেলাম দিয়া'। অরবিন্দ ও বিজয় নাগ বেয়ারার সঙ্গে যাইয়া সাহেবের ঘরে ঢুকিলেন। দশ-পনেরো মিনিট পরেই তাঁহারা সার্টিফিকেট লইয়া বাহির হইয়া আসেন। বিজয় নাগের কাছে শুনিয়াছিলাম, কয়েক মিনিটের আলাপেই সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অরবিন্দের শিক্ষা হইয়াছে ইংলণ্ডে। তাঁহাকে সাহেব এবিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছিলেন।

"অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছুটিল আবার সেই চাঁদপাল ঘাটের দিকে। অরবিন্দের চোখে মুখে চিন্তা-উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই নাই! ইহা নিয়া পরে আমাদের মধ্যে কথাও হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, অরবিন্দের জন্য আমাদের চিন্তা-উদ্বেগের অন্ত ছিল না। অমর-দা সত্যই বলিয়াছেন—'যাঁর জন্য উদ্বেগ, তিনি একেবারে নিরুদ্বেগই ছিলেন—যেন একটি সমাধিস্থ মূর্তি! সেদিনকার শ্রীঅরবিন্দের যে-চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বাস্তব ও নিখুঁত। অরবিন্দ যে চিন্তা-উদ্বেগ ও ভয়-ভাবনার অতীত পুরুষ, তিনি যে অভী—তাহা জানিতাম। কিন্তু ইতিপূর্বে ইহা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই।

"গাড়ী চাঁদপাল ঘাটে আসিয়া যখন পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। জিনিসপত্র কুলির মাথায় দিয়া আমরা চারজন 'ডুপ্লে' জাহাজে উঠিয়া সংরক্ষিত (reserved) ক্যাবিনটিতে প্রবেশ করিলাম। কুলি জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। বিজয় নাগ অরবিন্দের জন্য বিছানা করিতেছেন। অমর-দা আর আমি দোর-গোড়ায় অরবিন্দের মুখামুখি দাঁড়াইয়া। অমরদা জামার পকেট হইতে কতকগুলি ভাঁজকরা নোট লইয়া মিছরীবাবুর নাম করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি নোটগুলি নিলেন নিঃশব্দে হাত পাতিয়া, দেবতার চরণে মিছরীবাবুর এই শেষ অর্ঘ্য।

তারপর অমর-দা নতশিরে জোড়-হাত কপালে ছোঁয়াইয়া অরবিন্দকে নমস্কার করেন। আনত ললাট অরবিন্দ-পদে রাখিয়া আমি প্রণতি নিবেদন করিলাম, কৃতার্থ হইলাম দেবদেহ-স্পর্শে।

"বিজয়া-দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জনান্তে গৃহে ফিরিবার সময় মন যেমন অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, গঙ্গাবক্ষে ভাসমান জাহাজে দেবতা-বিদায়ের পর আমিও তেমনি অবসন্ন মনে বাড়ী ফিরিলাম।…জীবনের প্রভাতকালে একদা যে দেবতাকে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি হইতে বিদায় দিয়াছিলাম, আজ জীবনের অপরাহ্নে সেই দেবতারই পুনরাগমন্ কামনা করিতেছি। মা! আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে কি?"

পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহের পূর্বব্যবস্থা

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে নৌকাযোগে শ্রীঅরবিন্দকে চন্দননগরে পৌঁছে দিয়ে পরের দিন যখন সুরেশ চক্রবর্তী এবং বীরেন বোস ৪নং শ্যামপুকুর লেনের বাড়ীতে ফিরে এলেন তখন তাঁদের মনের অবস্থা গভীর অবসাদে অভিভূত। সুরেশবাবু নিজেই এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, প্রতিমা-বিসর্জন অন্তে রিক্ত চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চেয়ে গৃহবাসীর অন্তরে যেমন একটা হাহাকার জাগে, তেমনি সেই গৃহে শ্রীঅরবিন্দ মূর্তির অদর্শনে তাঁরা তাঁদের হৃদয় মনে এক বিরাট রিক্ততা এবং বেদনা অনুভব করলেন; শ্রীঅরবিন্দ-বিহীন গৃহে আর তাঁদের মন টিকলোনা, সুরেশবাবু সেই বাড়ী থেকে উঠে গিয়ে ৬নং ক্রাউচ লেনে একটা মেসে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এর প্রায় একমাস পরে একদিন সুরেশবাবু শ্রীঅরবিন্দের লেখা একটুকরা কাগজ পেলেন। তাতে এইরূপ নির্দেশ ছিল যে, শ্রীঅরবিন্দের জন্য একটা বাড়ী ঠিক করতে তাকে শিগ্‌গির পণ্ডিচেরী রওয়ানা হ'তে হবে। শ্রীসুকুমার মিত্র এবং সৌরীন বোস তাঁর পণ্ডিচেরী যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। সুকুমার বাবুর ব্যবস্থা মতো সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে মাদ্রাজ মেল ধ'রে পণ্ডিচেরী রওয়ানা হন। হাওড়া ষ্টেশনে সৌরীন বোস একটা ট্রাঙ্ক এবং বিছানাপত্র নিয়ে সুরেশবাবুর জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের লেখা একটি পরিচয়পত্র পণ্ডিচেরীতে শ্রীনিবাস আচারিয়াকে দেবার জন্য সুরেশ বাবুকে দেন। সুরেশ বাবু ৩০শে মার্চ রাত্রে পণ্ডিচেরী পৌঁছেন এবং রাত্রিকালটা ষ্টেশনে কাটিয়ে ৩১শে মার্চ ভোরে একটা পুশ্‌-পুশ্‌ গাড়ীতে ক'রে ১০নং রু ভালদুর-এ (No 10 Rue Valdour) শ্রীনিবাস আচারিয়ার বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। আচারিয়া মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ মতো তাঁর জন্য একটি বাড়ী ঠিক ক'রে রাখেন। কিন্তু সে-বাড়ী শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী পৌঁছার পূর্বে তিনি সুরেশবাবুকে দেখান নি। কারণ সুরেশবাবু সত্য সত্যই শ্রীঅরবিন্দের লোক, না কোনো গুপ্তচর সে-বিষয়ে শ্রীনিবাস আচারিয়ার মনে তখনও সন্দেহ ছিল, তাই সুরেশবাবু যখন শ্রীঅরবিন্দের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ী দেখতে চেয়েছিলেন তখন তাঁকে অন্য একটা বাড়ী দেখানো হ'য়েছিল, সে-বাড়ী সুরেশ বাবুর মনঃপূত হয়নি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যেদিন পণ্ডিচেরী পৌঁছলেন সেদিন আচারিয়া

মহাশয় শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যে-বাড়ীতে তুললেন সে-বাড়ী দেখে সুরেশবাবু অবাক হয়েছিলেন, কারণ এ-বাড়ী তাঁকে দেখানো হয়নি, সেই বাড়ীটি হচ্ছে— কোনটি ষ্ট্রীটে শঙ্কর চেট্টিয়ার বাড়ী। শোনা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যখন পণ্ডিচেরী আসেন তখন তিনি ঐ বাড়ীতেই শঙ্কর চেট্টিয়ার অতিথিরূপে বাস ক'রেছিলেন।

কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দ এবং বিজয় নাগের জন্য দুইটি ছদ্মনামে টিকিট কেনা হয়েছিল, নাম দু'টি সংগ্রহ করা হয়েছিল 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার গ্রাহক-তালিকা থেকে। শ্রীঅরবিন্দ—যতীন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিজয়নাগ—বঙ্কিমচন্দ্র বসাক, উভয়ে এই উভয় ছদ্মনামে কলকাতা থেকে 'ডুপ্লে' জাহাজে রওনা হয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পণ্ডিচেরী বন্দরে পৌছলেন। জাহাজ-ঘাটে সুরেশ চক্রবর্তী এবং শ্রীনিবাস আচার্য ইত্যাদি যারা শ্রীঅরবিন্দকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীয়ও ছিলেন। জাহাজ থেকে নেমে শ্রীঅরবিন্দ যখন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট নিভৃত-আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন তখন সূর্যদেব অস্তমিত প্রায়—

দিবসের ক্লান্ত রবি গেল অস্তাচলে
অরবিন্দ দিব্যসূর্য নামিল ভূতলে,—
বিচ্ছুরিত রশ্মি যত করি' সংবরণ
রশ্মিকেন্দ্রে রহিলেন আত্ম-নিমগন।
নব উষা নব জ্ঞান আনিতে মরতে
অরবিন্দ মহাসূর্য রহিল ভারতে॥

(মৎ প্রণীত শ্রীঅরবিন্দ চরিতামৃত থেকে)

শ্রীমায়ের সহযোগে পণ্ডিচেরী সাধনক্ষেত্রে

ঊর্ধ্বে অনন্ত বিস্তৃত মহাকাশ চিন্তাশীলচিত্তকে করে উদাস। এই ধরিত্রীর বুকে তেমনি বিশাল সাগর মানব-মনকে উধাও করে তার দিগন্ত-রেখার পানে। এই বিশ্বসৃষ্টিতে যা-কিছু বিশাল, যা-কিছু বিরাট—উদাসী মনকে তা-ই ডাকে হাতছানি দিয়ে। ধরার বুকে মহাসাগর তাই মানুষের কাছে এত আকর্ষণীয়।···নীলাচলে সমুদ্রতীরে শ্রীগৌরাঙ্গ এলেন পুরুষোত্তমের আকর্ষণে উধাও হ'য়ে, আপন ভুলে; স্থাপন করলেন তাঁর সাধন-আশ্রম সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। তেমনি শ্রীঅরবিন্দও এলেন পণ্ডিচেরী-সিন্ধুতীরে ঈশ্বরাদিষ্ট হ'য়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে।—সমুদ্রতীরবর্তী কোলাহলবিহীন প্রশান্ত পণ্ডিচেরী শহরকে তিনি বরণ করলেন তাঁর তপস্যাক্ষেত্ররূপে। পণ্ডিচেরীর আত্মা তখন ছিল প্রসুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য পাদস্পর্শে সেই প্রসুপ্ত শক্তি ক্রমে উঠ্‌লো জেগে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একত্র সহযোগে পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য যে সর্বসমন্বয়মূলক ভাবধারা এবং অধ্যাত্মধর্মের সৃষ্টি হবে তা তখনও মানুষের অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু মানুষ তা টের পেল, তার আভাস সূচিত হ'ল অনতিকাল পরেই—ফরাসী দেশ থেকে শ্রীমা যখন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এলেন পণ্ডিচেরী-ভূমিতে এবং শ্রীঅরবিন্দ যখন মায়ের সহযোগিতায় ঐ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশ শুরু করলেন তাঁর 'আর্য' মাসিক পত্রিকা। সেই পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দের সমন্বয়মূলক জ্ঞানধারা প্রকাশ হ'তে থাকলো বিভিন্ন বিষয়ে—প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে,—যথা "Essay on the Gita. 'The Life Divine", "Ideal of Human Unity" ইত্যাদি।····পণ্ডিচেরী সিন্ধুতীরে এই যে শিব-শক্তির সহযোগ ঘটলো, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে কেউই কাউকে জানতেন না বাস্তবরূপে। কিন্তু তবুও উভয়ের মধ্যে একই জ্ঞান ও একই সত্যের বিকাশ হ'য়ে চলেছিল পরস্পরের অগোচরে পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে।

শ্রীমা তাঁর কিশোর বয়সেই স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম স্থির নির্দিষ্ট হ'য়ে আছে এক কমনীয় যুগপুরুষের পাশে। এ বিষয়ে অবতরণিকায় শ্রীমায়েব কথায় তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই যুগপুরুষের রূপটি শ্রীমায়ের ধ্যানলোকেও পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে তাঁর পরবর্তী জীবনে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে, যার বাস্তব পরিচয় প্রথম তিনি পেলেন

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়েই শ্রীমায়ের স্বামী পল রিশার ফরাসী দেশ থেকে পণ্ডিচেরী এলেন প্যারিসের লোকসভায় পণ্ডিচেরী থেকে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার জন্য। পল রিশার একজন সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক ব্যক্তি। তাঁর চেতনাতেও এ সত্য প্রতিভাত হয়েছিল যে, এই পৃথিবীতে কোথাও সব দিব্যমানবের আবির্ভাব ঘটেছে এবং সেই দিব্যপুরুষদের আবিষ্কারের জন্য তিনি ইউরোপ এবং এশিয়ার বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। তিনি যখন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরী রওনা হবেন তখন শ্রীমা তাঁকে বলেছিলেন—"তুমি তো ভারতে যাচ্ছ, একবার খোঁজ ক'রে দেখো যদি সে রকম কোনো যুগপুরুষের সন্ধান সেখানে পাও।"···পল রিশারের মনেও এই ইচ্ছা ছিল ঃ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত দেব-মানবের সন্ধানের।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আসার কয়েক মাস পরেই পল রিশার পণ্ডিচেরী এসে খোঁজ পেলেন যে, একজন দেশপ্রেমিক যোগীপুরুষ ব্রিটিশ-ভারত থেকে গোপনে চ'লে এসে পণ্ডিচেরীতে ফরাসী-সরকারের আশ্রয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন। পল রিশার গভর্ণমেণ্টের লোক, তাই তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন। শ্রীঅরবিন্দকে দেখেই তাঁর মন ব'লে উঠলো—ইনিই তাঁর উপলব্ধিগত এবং তাঁর পত্নীর স্বপ্নদৃষ্ট সেই দিব্যপুরুষ হবেন।···তিনি এঁর পরিচয় জানালেন শ্রীমাকে এক পত্রে। তখন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পত্র-মারফতে শ্রীমায়ের কয়েকটি প্রশ্নের আদান-প্রদান হ'ল। শ্রীমা স্থির নিশ্চয় হলেন ঃ ইনিই তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট সেই দিব্যপুরুষ।··· পল রিশার যখন চার বছর পরে পুনরায় পণ্ডিচেরী এলেন প্যারিস থেকে, শ্রীমাও এলেন তাঁর সঙ্গে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ তারিখে শ্রীমা প্রথম দেখলেন শ্রীঅরবিন্দকে এবং প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝলেন ঃ ইনিই তাঁর ধ্যানদৃষ্ট সেই কৃষ্ণ।···এই দম্পতি-যুগলের সহযোগিতায় তখন শ্রীঅরবিন্দ ঐ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট তারিখে 'আর্য' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলেন তা' পূর্বে বলা হয়েছে। ঐ খ্রীষ্টাব্দেই ইয়োরোপে বেধে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। ফরাসী সরকারের নির্দেশে তখন পল রিশারকে পণ্ডিচেরী ত্যাগ ক'রে ফ্রান্স যাত্রা করতে হ'ল। মায়ের যাত্রাও স্থির হ'ল সেই সঙ্গে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। শ্রীমায়ের ফ্রান্স যাত্রার পূর্ব দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রীঅরবিন্দ ভারতভূমিতে সর্বপ্রথম শ্রীমায়ের জন্মদিন পালন করলেন,—ভারত-জননী তথা জগজ্জননীরূপে মায়ের অভিষেক হ'ল পণ্ডিচেরী

সিন্ধুতীরে ভারতবাসীর অগোচরে।* পর দিবস, ২২শে ফেব্রুয়ারী, শ্রীমা পণ্ডিচেরী ত্যাগ ক'রে ফ্রান্স যাত্রা করলেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন একাই 'আর্য' পত্রিকা চালিয়ে যেতে থাকলেন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'আর্য' প্রকাশ বন্ধ করলেন।

শ্রীমা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি পণ্ডিচেরী হ'তে রওনা হ'য়ে যখন প্যারিসে গিয়ে পৌছলেন তখন দেখলেন: শত্রুসৈন্য বোমার আঘাতে প্যারিস শহরকে বিধ্বস্ত করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। শ্রীমা সেই যুদ্ধ-বিভীষিকা সহ্য করতে পারলেন না,—জাহাজযোগে তিনি জাপান রওনা হলেন। তাঁদের জাহাজ শত্রুপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হ'ল। কিন্তু এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে সেই জাহাজ বিপন্মুক্ত হ'য়ে যথাসময়ে জাপানে গিয়ে পৌছলো। মা সেখানে শান্তিপূর্ণ নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করতে থাকলেন এবং টোকিও শহরে সভা-সমিতিতে তিনি তাঁর নবলব্ধ অধ্যাত্মজ্ঞান এবং নবযুগবাণী পরিবেশন ক'রে চল্‌লেন। পল রিশার সেখানে একদিন এক সভায় তাঁর শ্রীঅরবিন্দকে আবিষ্কারের কথা ঘোষণা ক'রে বল্‌লেন:

"I have traversed. I traverse the earth, seeking for the sons of Heaven. For the hour is coming of the great things, the hour of the great events and also of the great men, the divine men of Asia. All my life I have sought for them across the world. For all my life I have felt that they must exist somewhere in the world that this world would die if they did not live. For they are its light, its heat, its life. It is in Asia that I have found the greatest among them, the leader, the hero of tomorrow.

He is a Hindu. He is named Aurobindo Ghosh. He was born in Calcutta on the 15th August, 1872.

—Tokio, June, 1917.

* এই একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটি এক অত্যাশ্চর্য সংযোগ-দিবস। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী সিন্ধুতীরে শ্রীমায়ের আবির্ভাব-দিবস পালন করলেন ভারত-জননীরূপে: ঐ ১৯১৫ খ্রীঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে মহা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিবসরূপে স্থির করলেন দেশ-জননীর মুক্তির দাবী জানিয়ে প্রচণ্ডভাবে কলিকাতা শহরে।

শ্রীঅরবিন্দ কে? তা ফরাসী মনীষী পল রিশার চিনে ফেলেছিলেন সেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেই এবং তাঁর সেই দিব্য আবিষ্কারের বিষয় তিনি ঘোষণা করলেন প্রকাশ্য জনসভায়, জাপানে—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেই সময় জাপান-সফরে গিয়েছিলেন। পল রিশার এবং শ্রীমায়ের সহিত সেখানে তাঁর পরিচয় হয়। এই দম্পতিযুগলের প্রতিভা লক্ষ্য ক'রে তিনি বিস্মিত হন! বিশেষ ক'রে মায়ের সহিত আলাপে তিনি আশ্চর্য এবং মুগ্ধ হন। কবি তখন ভাবেন: এই নারী যদি তাঁর শান্তিনিকেতনে গিয়ে আশ্রমের পরিচালনভার গ্রহণ করেন তবে শান্তিনিকেতন সর্বাঙ্গীণরূপে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে। এ বিষয়ে কবি শ্রীমায়ের নিকট যখন প্রস্তাব করেন, শ্রীমা সবিনয়ে কবির সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ মা স্থির নিশ্চয়রূপে জানতেন যে তাঁর দিব্য কর্ম বিধিনির্দিষ্ট হ'য়ে আছে শ্রীঅরবিন্দেরই পাশে পণ্ডিচেরী সিন্ধুতীরে। তিনি শুধু সময়ের অপেক্ষায় আছেন।

* *

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল তারিখে শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরী এসে পৌছলেন বিজয় নাগকে সঙ্গে নিয়ে, তখন সুরেশ চক্রবর্তী আর বিজয় নাগ এই দু'জন সেবকই শ্রীঅরবিন্দের সেবা-যজ্ঞ চালিয়ে যেতে থাকলেন। কয়েক মাস পরেই এলেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত শ্রীগুরুর সেবার সংকল্প নিয়ে। তার পর শ্রীঅরবিন্দের শ্যালক সৌরীন বসুও এসে হাজির হ'লেন। তামিল যুবা আরাভামুদা (অমৃত) তাঁর পল্লী-ভবন ছেড়ে এক অহেতুক আকর্ষণে পণ্ডিচেরী শহরে এসে পৌছলেন—পণ্ডিচেরীর হাই স্কুলে অধ্যয়ন মানসে। তাঁর মন-প্রাণকে আকর্ষণ করলো—'অরবিন্দ'-নাম। সেই তামিল যুবা তাঁর হৃদয়ের ঐকান্তিক আকৃতির ফলে পেলেন তাঁর ইষ্ট শ্রীঅরবিন্দের দর্শন। যুবকের সমগ্র সত্তা সমর্পিত হ'ল শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণে। ক্রমে শ্রীগুরু-সান্নিধ্যে বাস ঘটলো সেই যুবকের জীবনে। এই ভাবে শ্রীঅরবিন্দের আকর্ষণে, শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে পণ্ডিচেরীতে কতিপয় গুণী-জ্ঞানী ভক্তের সমাবেশ হ'তে থাকলো। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আগমনের প্রথম অবস্থায় অরবিন্দভক্ত মতিলাল রায় চন্দননগর থেকে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁদের খরচের জন্য সময়ে-সময়ে অর্থ জোগাতে থাকেন। এই সময় এমন একটা অবস্থা আসে যে, শ্রীঅরবিন্দের অর্থাভাব চরমে ওঠে। আংশিকভাবে মতিলাল রায় তা পূরণ করতে

থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর কয়েকটি পত্রের আদান-প্রদানও হয়।

তামিলনাদের এক জমিদারের গুরুদেব যখন দেহত্যাগের সংকল্প করেন তখন উক্ত জমিদার তাঁর গুরুদেবের কাছে কিছু উপদেশ এবং জ্ঞান প্রার্থনা করেন। গুরুদেব তখন তাঁকে বলেন যে, উত্তর ভারত থেকে একজন যোগী দক্ষিণ ভারতে আসবেন। তিনি সেই যোগীর তিনটি স্বরূপের কথাও তাঁকে বলেন। "এই তিনটি স্বরূপ-চিহ্নে তোমরা সেই যোগী-পুরুষকে উত্তর-যোগীরূপে চিনে নিতে পারবে এবং তাঁরই কাছে তোমরা পাবে প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ এবং পথনির্দেশ।"...শ্রীঅরবিন্দ উত্তর ভারত থেকে পণ্ডিচেরী আসার পর উক্ত জমিদার সন্ধান পেয়ে পণ্ডিচেরী এসে শ্রীঅরবিন্দকে চিনতে পারেন তাঁদের গুরু-নির্দেশিত 'উত্তরযোগী'রূপে। তিনি তখন শ্রীঅরবিন্দের সেবা এবং তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ সাহায্য করতে থাকেন।...কয়েক বছর পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর 'সাগর সঙ্গীত' ইংরাজীতে অনুবাদ করার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করেন। দ্বীপান্তরবাস থেকে মুক্তি পেয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ যখন পণ্ডিচেরী যান তখন তিনি অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় পণ্ডিচেরীর বাহিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তা সমর্থন করেননি, তিনি বলেছিলেন অপেক্ষা করতে। কারণ তিনি জানতেন যে, অর্থশক্তির উপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য শীঘ্রই আসবে, তখন অর্থাভাব ঘুচে যাবে।

যুদ্ধ-শান্তির পর শ্রীমা জাপান থেকে শ্রীঅরবিন্দের সহিত পত্রযোগ স্থাপন ক'রে, শ্রীঅরবিন্দের অনুমতিক্রমে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরী চ'লে এলেন। মাতৃশক্তির প্রভাবে এবং সহযোগিতায় তখন ধীরে ধীরে অর্থাভাব গেল ঘুচে। মা এসে শ্রীঅরবিন্দের সেবা-যত্নের ভার নিজে গ্রহণ করলেন। এতদিন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কয়েকজন শিষ্যসহ ভাড়া-বাড়ীতেই বাস করছিলেন—বাড়ী বদল ক'রে ক'রে। গেস্ট হাউসে একাদিক্রমে তাঁর কয়েক বছরই কাটে। মা-ও এসে এই গেস্ট হাউসেই কিছুকাল থাকেন। মা তখন বুঝলেন যে, ভগবানের বাসের জন্য তাঁর নিজস্ব বাসগৃহের প্রয়োজন। এক তামিল ভক্তের অর্থে প্রথম কেনা হ'ল শ্রীঅরবিন্দের বাসের জন্য একটি দ্বিতল গৃহ। সেটি হ'চ্ছে মুখ্য আশ্রমের রিসেপ্‌শান-হলের গৃহ। এই গৃহের দ্বিতলে শ্রীঅরবিন্দ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বাস করেন। মাতৃশক্তিরই প্রভাবে শ্রীঅরবিন্দ

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দের একান্ত-বাস শুরু হয় পৃথক গৃহের দ্বিতল-কক্ষে—যেটি এখন শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকক্ষরূপে চিহ্নিত। এই কক্ষেই শ্রীঅরবিন্দ একাদিক্রমে ২৪ বৎসর বাস করেন—১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মহাপ্রয়াণদিবস পর্যন্ত।…

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ মানসে পণ্ডিচেরী যান। ৫ই জুন তারিখে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে হয় তাঁর আলাপন। স্বদেশে স্বরাজ্য পার্টি গঠনে তিনি লাভ করেন শ্রীঅরবিন্দের সমর্থন ও আশীর্বাদ। বাংলায় ফিরে গান্ধীজীর আত্মঘাতী বন্ধ নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, আংশিক স্বরাজের সুযোগকে গ্রহণ ক'রে তিনি এগিয়ে চলেন পূর্ণ স্বরাজ-অর্জনের পথে।—মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায় ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিয়ে দেশবন্ধুর সহিত সহযোগিতা করেন। এখানেই গান্ধীজীর নন্ কোঅপারেশন নীতির হয় অবসান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই নূতন নীতিকে (কাউন্সিল এণ্ট্রি) অবলম্বন ক'রে পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ৯টি প্রদেশে তার নিজস্ব মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনে হয় সমর্থ। কেবল বাংলায় গঠিত হয় মুস্‌লীম্ লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী—উভয় বঙ্গে তখন মুস্‌লীম মেজরিটি থাকায়।

* * *

অতিমানস্-শক্তির অবতরণ সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি অর্জনের পূর্বে অধিমানস-লোকের সত্যকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় দেহে পূর্ণরূপে মূর্ত ক'রে তোলা শ্রীঅরবিন্দ অতি অবশ্য প্রয়োজন ব'লে মনে করলেন এবং সে-সিদ্ধি তিনি অর্জন করলেন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর তারিখে। এবিষয়ে এই গ্রন্থের অবতরণিকায়ও আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত দিবসের অনুষ্ঠানের কিছু পরিচয় এখানে দিচ্ছি।—ঐ দিনের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যহ বৈকালে শিষ্যবর্গ পরিবেষ্টিত হ'য়ে, চেয়ারে ব'সে শিষ্যদের নানা বিষয়েব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন ; এই বৈঠকে বিবিধ বিষয়ে আলোচনা চলতো। প্রতিদিনের বৈঠকের সেইসব আলোচনার বিষয় 'সান্ধ্যবৈঠক' নামক পুস্তকে প্রকাশ হয়েছে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর হ'তে উক্ত সান্ধ্য বৈঠক গেল বন্ধ হ'য়ে। শ্রীমায়ের সহিত যুক্তি-পরামর্শ ক'রে উক্ত দিবস হ'তে শ্রীঅরবিন্দ একান্ত বাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যে গৃহান্তরে যাবার পূর্বে বৈকালে শ্রীঅরবিন্দের কক্ষে এক পবিত্র এবং ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'ল।—আশ্রমের সাধকগণ তখন কেউ-কেউ সান্ধ্যভ্রমণ উদ্দেশ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কেউ তাঁদের আবাসে। প্রত্যেকের খোঁজে তখন লোক পাঠানো

হ'ল তাদের সবাইকে শ্রীঅরবিন্দের কক্ষে সমবেত হবার জন্য নির্দেশ দিয়ে। খবর পেয়ে সবাই এসে হাজির হলেন মনে কৌতূহল নিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে শ্রীঅরবিন্দের বাস-কক্ষের সংলগ্ন হল-ঘরে প্রবেশ ক'রে যে দৃশ্য তাঁরা দেখলেন তাতে বিস্ময়বিমুগ্ধ এবং অভিভূত হলেন সবাই!—শ্রীঅরবিন্দ এক কেদারায় সমাসীন, শ্রীমা উপবিষ্টা তাঁর পাশে একটি অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে; শ্রীঅরবিন্দের বামহস্ত রক্ষিত শ্রীমাতার শিরোপরি। দক্ষিণহস্তদ্বারা তিনি একে-একে প্রণামরত সাধকের মস্তক স্পর্শ ক'রে বিতরণ ক'রে চলেছেন তাঁর দিব্য আশীর্বাদ। সেই শুভ মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দ-আধারে পূর্ণরূপে প্রমূর্ত সেই পুরুষোত্তম!—'দত্তা' নামে ইংরাজ মহিলা-সাধিকা ঘোষণা করলেন সেই শুভানুষ্ঠানের গূঢ় তাৎপর্য। দ্বাপরযুগে যিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবকী-উদরে, বৃন্দাবন-লীলায় এসেছিলেন নেমে—এ তাঁরি আবির্ভাব শ্রীঅরবিন্দ-বপুতে। তাই শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের শতবর্ষপূর্তিতে লালপদ্মের স্থলে নীলপদ্মই সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।··সেই বৃন্দাবন সেদিন পুনঃপ্রকট হ'ল পণ্ডিচেরী ধামে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দবনলীলা যে আংশিকরূপে পণ্ডিচেরী-ভূমে প্রকট হবে তা' কোনো-এক শুভক্ষণে প্রতিভাত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের এক বর্ষীয়সী সাধিকার দৃষ্টিতে উক্ত অনুষ্ঠানের দু'তিন বছর পূর্বেই। একদিন উক্ত সাধিকা তাঁর ভাব-দৃষ্টিতে দেখলেন: কিশোর-কৃষ্ণ দিব্য-গোবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বংশীহস্তে সহাস্যবদনে বিরাজিত পণ্ডিচেরী আশ্রমভূমিতে; তাঁর চতুর্দিক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত!··এই দৃশ্য দেখে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তাঁর বিশ্বাস স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই কৃষ্ণরূপে পণ্ডিচেরী আশ্রমে বিরাজমান।···উক্ত সাধিকার ঐ প্রশ্নে শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হেসেছিলেন মাত্র।···বৈষ্ণব ভক্ত বলেছেন—"অদ্যাবধি সেই লীলা করে কৃষ্ণ-রায়, কোনো-কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" ··এই উক্তির সত্যতা পরিস্ফুট হয়েছিল উক্ত সাধিকার অন্তর্দৃষ্টিতে,—পণ্ডিচেরীধামে তিনি দর্শন করেছিলেন বৃন্দাবনধামের গোষ্ঠলীলা।···এছাড়া, শ্রীমা যখন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আশ্রম-আবাসে ছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ গৃহের দোতলার বারান্দায় নিত্য আবির্ভূত হ'য়ে শ্রীমায়ের হাত ধরে পায়চারী করতেন! এ দৃশ্য শ্রীঅরবিন্দ নিত্য দেখতেন স্বীয় কক্ষ হতে।···জগন্মাতা যখন যেখানে আবির্ভূতা হন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও সেখানে বিরাজমান থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তগণ এই তিন রূপেই শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেছেন—আপন-আপন ইষ্টরূপে।···

উক্ত ২৪শে নভেম্বরের অনুষ্ঠানে শ্রীঅরবিন্দ মাতৃদেহে তাঁর শক্তি সঞ্চারিত ক'রে * এবং তাঁর দিব্যস্পর্শে শিষ্যমণ্ডলীর প্রাণে পরম তৃপ্তি ও অভয় দান ক'রে শুরু করলেন তাঁর একান্তবাস অতিমানস-সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি অর্জন মানসে। সেইদিন থেকে শ্রীমা-ই হলেন সাধক-সাধিকাদের জীবনের এবং আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননী। শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশ দিয়ে গেলেন : তাঁর পূর্ণযোগে সিদ্ধি অর্জনের জন্য এই মায়ের নিকট সাধক-সাধিকাদের পূর্ণ আনুগত্য এবং সমর্পণ প্রয়োজন। কারণ জগন্মাতা স্বয়ং এই আধারে পূর্ণরূপে প্রকটিতা,—ইনিই শ্রীঅরবিন্দের পরাশক্তি। এই মায়ের বহুমুখীন প্রতিভা এবং রূপ বিশ্লেষণ ক'বে শ্রীঅরবিন্দ "The Mother" নামে পুস্তক প্রণয়ন করলেন।...

অনেক সাধক শ্রীগুরুর একান্তবাস-বরণে গুরুসংস্পর্শলাভে বঞ্চিত হ'য়ে মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। করুণাময় ভক্তবৎসল শ্রীঅরবিন্দ সবাইকে আশ্বাস দিয়ে জানালেন যে, সাধকগণ তাদের সাধন-সমস্যা বিষয়ে তাঁকে পত্র লিখলে তিনি তার জবাব দেবেন। শ্রীগুরুর এই আশ্বাস-বাণীতে অনেকে আশ্বস্ত হলেন,— শ্রীমায়ের শ্রীচরণতলে এগিয়ে চললো তাঁদের সাধন-জীবন।—মাতৃ-আকর্ষণে ক্রমে বাড়তে থাকলো সাধক-সংখ্যা। সেই সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকলো আশ্রমের আবাস-গৃহ। ধীরে ধীরে নানা শিল্প-বিভাগও সৃষ্টি হ'ল আশ্রমে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বাংলাদেশ থেকে অনিল বরণ রায় শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ ক'রে আশ্রমে এসে গেছেন। তার পূর্বে এসেছেন ফরাসীদেশ থেকে অন্বেষু পবিত্র। গুজরাট থেকে এসেছেন যুবক চম্পকলাল, এবং পুরানী ইত্যাদি দেশকর্মীও এসেছেন। তামিলনাদের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রীও এসেছেন শ্রীঅরবিন্দ-প্রভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে। আর্জব, অমলকিরণ আদি জিজ্ঞাসু আধারও এসে হাজির হয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের আকর্ষণে। সঙ্গীত বিশারদ সুকণ্ঠ দিলীপকুমার রায়ও পরে এলেন শ্রীগুরু-সান্নিধ্যে। পূর্ববঙ্গের ভারত ব্রহ্মচারীর শিষ্য যোগানন্দও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এলেন শ্রীগুরু-নির্দেশে—তাঁর গুরুর ধ্যানদৃষ্ট দ্বিভুজা মায়ের সন্ধানে এবং শ্রীমায়ের চরণে পেলেন আশ্রয়। এইভাবে ক্রমেই আশ্রম-পরিধি এবং সাধকগোষ্ঠী বৃদ্ধি পেতে থাকলো। শ্রীমা-প্রতিষ্ঠিত শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম মায়ের

* মাতৃদেহে শ্রীঅরবিন্দের এইরূপ শক্তি-সঞ্চারণ বিষয়ে শ্রীমা নিজে একবার ক্লাসে বলেন : এই নীরবতার অবস্থা আমি ঠিক ঐ সময়েই লাভ করি তাঁর কাছ থেকে। তিনিই আমার মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেন ঐ ১৯ ৪ সালেই।" (বর্তিকা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩)

ঐশী-প্রেরণাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিস্তারলাভ করেছে। এ বিষয়ে মায়ের কোনো স্থির পরিকল্পনা ছিল না। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন [For th3 Ashram] there has never been, at any tme, a mental plan, fixed programme or any organisation decided beforehand. The whole thing has taken birth, grown and developed as a living being by a movement of consciousness (Chit-tapas) constantly maintained, increased and fortified"···একান্তবাসের পর করুণামূর্তি শ্রীঅরবিন্দ ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্ধনের জন্য তাঁর পরাশক্তি শ্রীমাতাকে দক্ষিণে নিয়ে দর্শন দিতে শুরু করলেন বৎসরে তিনটি নির্দিষ্ট দিনে—২১শে ফেব্রুয়ারি শ্রীমায়ের জন্মদিবসে, ১৫ই আগষ্ট স্বীয় আবির্ভাব দিবসে এবং ২৪শে নভেম্বর সিদ্ধি-দিবসে। এই অপূর্ব দর্শন লাভের জন্য বাইরের জগৎ থেকেও শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীরা আশ্রমে আসতে শুরু করলেন শ্রীঅরবিন্দের অনুমতিক্রমে। জাগ্রত শিবশক্তির স্পর্শে এবং আশীর্বাদে সকলের জীবন হয় ধন্য। ক্রমে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সমগ্র জগতের বহু চিন্তাশীল এবং ভক্তপ্রাণ ব্যক্তিদের নিকট এক বিশেষ আকর্ষণের ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হ'ল।

সমগ্র পৃথিবীতে যে একদিন সত্য এবং আনন্দের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, নূতন আলোক-প্রপাত ঘটবে পৃথিবীর বুকে, হবে নূতন জগতের সৃষ্টি। মানব-সভ্যতার প্রথম প্রভাত থেকে যেসব মহাপুরুষ এবং দ্রষ্টা ঋষিগণ মানুষকে শুনিয়ে এসেছেন: ভবিষ্য মঙ্গলের আশার বাণী, তা' হবে পূর্ণ— এ-কথা মা-শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করলেন সুস্পষ্ট বাণীতে—"New Light will break upon the earth, New world will be born, things that were promised will be fulfilled."··· এতবড় আশা-ভরসার বাণী এরকম সুস্পষ্টরূপে আর কেউ শোনায়নি। এ-সত্য মা-শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন তাই ওরকম নিশ্চয়-বাণীতে ঘোষণা করতে পারলেন উক্ত আশার বাণী। তাঁদের ঐ বাণীকে ব্যর্থ করতে সত্যবিরোধী অসুরশক্তি উঠলো জেগে। কারণ সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে মিথ্যা আসুরিক শক্তির আর কোনো স্থান থাকে না এই সৃষ্টিতে। তাই ভারতের জাগ্রত আত্মশক্তিকে অসুর মনে করলো: পৃথিবীর বুকে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ এবং বলবৎ রাখার পথে বিরাট অন্তরায়। এই বুঝে হিটলার-অসুর হান্‌লো তার অমোঘ শক্তি ভারতের বুকে। সেই আঘাতকে বিশ্বম্ভর শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করলেন স্বীয় দেহে, জগদ্বাসীকে রক্ষার জন্য। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর

মাসে ঘটলো এই ঘটনা!—শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এ-বিষয়ে মন্তব্য ক'রে তাঁর "স্মৃতির পাতা"য় লিখেছেন—"মানবজাতির এ মহাসঙ্কট-মুহূর্তে—পৃথিবীর সমস্ত ভবিষ্যৎ যখন নির্ভর করছে যুদ্ধের ফলাফলের উপর তখন এই অশনিসম্পাত, পৃথিবীর উপর অপশক্তির সম্পূর্ণ আক্রমণ আপনার দেহের মধ্যে গ্রহণ করলেন পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য। নতুবা পার্থিব শক্তির সামর্থ্য ছিল না এই দুর্বার শক্তিকে হটিয়ে রাখে। এই বিশ্বগ্রাসী বিষ তিনি গলাধঃকরণ করলেন নীলকণ্ঠ হ'য়ে। এ যেন নিজের দেহ থেকে অস্থিদান দধীচির মত—তা দিয়ে অসুরঘাতী বজ্র নির্মাণের জন্য। ১৯৩৮ সালে তাঁর শরীরের উপর যে আঘাত হল তার এই নিহিত অর্থ।"...অসুর শক্তির সেই প্রচণ্ড আক্রমণে শ্রীঅরবিন্দ ভীষণ আঘাত পেলেন তাঁর জানুতে—২৪শে নভেম্বর-দর্শনের পূর্বদিনে; দর্শন স্থগিত থাকলো। দর্শন-মানসে সমবেত ভক্তমণ্ডলী হলেন মুহ্যমান, হলেন নিরাশ এবং বিস্মিত!...বম্বে থেকে ভক্ত-ডাক্তার মণিলাল এলেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। আশ্রমের সাধক-ডাক্তার নীরদবরণকে মা নিযুক্ত করলেন শ্রীগুরুর পরিচর্যার জন্য।—তখন থেকে শ্রীঅরবিন্দের একান্তবাসের নিয়ম-কানুন কতক পরিমাণে হল শিথিল।—শ্রীঅরবিন্দকে চিকিৎসাধীন থাকতে হল কয়েক মাস। তিনি যখন আরোগ্য হ'য়ে উঠলেন তখন তাঁকে ঘিরে কয়েকজন ভক্তবৃন্দের সহিত পুনরায় সান্ধ্য-বৈঠক হ'ল শুরু। সেইসব আলোচনা নীরদবরণ তাঁর "কথাবার্তায়" প্রকাশ করেছেন শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের পরে।

উক্ত দুর্ঘটনার কয়েকমাস পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক'রে শ্রীঅরবিন্দ পুনরায় দর্শনদান শুরু করলেন—মায়ের আশ্রম-আগমন-দিবস ২৪শে এপ্রিল তারিখে।—ভক্তবৃন্দ তখন থেকে বৎসরে মোট ৪ দিন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুগাসুর আত্মপ্রকাশ করলো হিটলাররূপে। মা এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করলেন: উক্ত বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যদি বিজয়ী হয় তবে পৃথিবীতে মানব-প্রগতি হাজার বছর যাবে পিছিয়ে, মানুষের অবস্থা হবে অধিকতর নিকৃষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ নিজে লিখেছিলেন—"The victory of one side (the Allies) would keep the path open for the evolutionary forces: the victory of the other side (Hitler) would drag back humanity, degrade it horribly and might lead even, at the worst, to its eventual failure as raee...তাই শ্রীঅরবিন্দ মিত্রশক্তির

বিজয় কামনা ক'রে যুদ্ধ-তহবিলে এক হাজার টাকা দান করলেন মিত্রশক্তিকে আশীর্বাদ ক'রে।—মা-শ্রীঅরবিন্দ একান্তভাবে চাইলেন: হিটলারের পরাজয় ও নিধন, এবং মিত্রশক্তির বিজয় কামনা করলেন সর্বান্তঃকরণে। তাঁরা ঘোষণা করলেন: "We look forward to the victory of Britain, and as the eventual result, an era of peace and union among the nations and a better and more secure world-order."

অসুর-শক্তি অমিত বিক্রমে প্রধাবিত হ'ল সমগ্র ইউরোপের উপর আধিপত্য বিস্তারে।—ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে ফরাসীর পরাজয় ঘটিয়ে হিটলার এগিয়ে চল্‌লো ইংলণ্ড বিজয়ের পথে;—বোমার পর বোমা বর্ষণ ক'রে ইংলণ্ডকে বিধ্বস্ত করতে শুরু করলো।—ডানকার্কের যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য ছিট্‌কে পড়তে থাকলো হিটলার-সেনার আক্রমণে! পশ্চাদ্‌ অপসরণ ক'রে ব্রিটিশ-সেনা প্রাণ বাঁচালো।—হিটলার তখন ঘোষণা করলো—"On the 15th of August I shall drink in the Backingham Palace"…অর্থাৎ—১৫ই আগষ্ট হিটলার ইংলণ্ড জয় ক'রে, বাকিংহাম প্রাসাদে প্রবেশ করবে।… শ্রীঅরবিন্দ তখন বুঝলেন: হিটলারকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, তার অগ্রগতি এবার রোধ করা প্রয়োজন জগৎকে ফ্যাসিসিজমের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য।—ভারতের আত্মমূর্তি শ্রীঅরবিন্দ তখন প্রয়োগ করলেন তাঁর অব্যর্থ অধ্যাত্মশক্তি হিটলারের অগ্রগতি রোধে, এবং পরিশেষে তার নিধন-সাধন মানসে, সমগ্র মানবজাতিকে অসুর শক্তির কবল থেকে রক্ষার জন্য। ভারতের সর্বজয়ী অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগফলে, ডানকার্কের সেই চরম মুহূর্তে হিটলার হ'ল বিভ্রান্ত, তার মতিগতি গেল ফিরে,—ইংলণ্ড বিজয়ের পথে আর অগ্রসর না হ'য়ে হিটলার ডানকার্ক থেকে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।…পরে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ উদ্দেশ্যে যখন পোল্যাণ্ডের ভূমিতে পা বাড়ালো, রাশিয়ার ষ্ট্যালিনও তখন উঠে দাঁড়ালো হিটলারের বিরুদ্ধে। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করুক তা মা-শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হিটলার এবং ষ্ট্যালিন তাদের উভয় দেশের মাঝে অনাক্রমণ চুক্তি (Non-aggres-ion pact) স্বাক্ষর করে—অর্থাৎ সেই যুদ্ধে কেউ কাকেও আক্রমণ করবে না। এইভাবে বৃহত্তর অসুর ষ্ট্যালিন হিটলার-অসুরের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু বিশ্বজননীর ইচ্ছা

অনুরূপ। মা-শ্রীঅরবিন্দ এ সত্য পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন যে, ষ্টালিনকে হিটলারের বিরুদ্ধে ভিড়াতে না পারলে, হিটলারের পরাজয় এবং নিধন সম্ভবপর নয়। মা জানতেন, সেই 'যুদ্ধে হিটলার তার গতিবিধি এবং যুদ্ধ-নীতি নিয়ন্ত্রিত করে এক অসুরের নির্দেশে।—অসুরটি হিটলারের সামনে হাজির হ'য়ে তাকে নির্দেশ দিয়ে যায় কীভাবে তার সৈন্য পরিচালনা করতে হবে এবং কখন কাকে আক্রমণ করতে হবে।...

সর্বসিদ্ধা মা তখন করলেন কি: হিটলারের মন্ত্রণাদাতা সেই অসুর বা রাক্ষসের বিশেষ মূর্তি ধারণ করে. গিয়ে হাজির হলেন হিটলারের ব্যাভেরিয়ান আল্পসে গোপন হেড-কোয়ার্টারে এবং হিটলারকে হুকুম দিলেন রাশিয়া আক্রমণ করতে। হিটলারের পরামর্শদাতা সেই অসুর হিটলারের কাছে আসতো রৌপ্যবর্মে আবৃত হ'য়ে এবং রৌপ্য শিরস্ত্রাণ প'রে। সেই হেলমেটে পাখীর পালকের মতো একটা জিনিস থাকতো আর সেই পালক থেকে প্রদীপ্ত শিখা হ'ত বিচ্ছুরিত। শ্রীমা ঠিক ঐ বেশ ধারণ ক'রে, অসুর-মূর্তিতে হিটলার সমীপে উপস্থিত হ'য়ে হিটলারকে রাশিয়া আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে ফিরে আসছেন এমন সময় মুখোমুখী আসল অসুরটার সঙ্গে তাঁর দেখা। সেই অসুরটা ঠিক তারই মতো একটা মূর্তি তার সামনে দেখে অবাক! সে তখন হিটলারের কাছে যাচ্ছিল। অসুরটা তখন বুঝে নিল: যা ঘটেছে। কারণ অসুরশক্তিও সর্বজ্ঞ এবং মহাশক্তিধর। তাই দেবশক্তিকে বার-বার পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে অসুরশক্তির কাছে। তখন মাতৃশক্তি স্বয়ং আবির্ভূ'তা হ'য়ে রক্ষা করেছেন দেবতাবৃন্দকে এবং মানুষকে।

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে, হিটলারের পরামর্শদাতা সেই অসুরটা দ্রুত হিটলারের সামনে হাজির হ'য়ে তাকে রাশিয়া আক্রমণ করতে নিষেধ করলো। কিন্তু হিটলার তখন রাশিয়া আক্রমণে দৃঢ় সঙ্কল্প। কারণ হিটলার চায়নি ইউরোপে কমিউনিজম্ বিস্তারলাভ করে।—সেই যুদ্ধে হিটলার স্পষ্ট বলেছিল: **Hitler's defeat means Bolshevised the whole Europe"**... হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে ১৯৪১-এর ২২শে জুন তারিখে। ষ্টালিন তার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে হিটলারের পরাজয়ে।...ভগবান কাঁটা দিয়ে করলেন কাঁটা উদ্ধার,—ষ্টালিন-দানবকে অবলম্বন ক'রে হিটলার-অসুর-নিধন-বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন তিনি। এই যুদ্ধে রাশিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল বটে, কিন্তু সমগ্র মানব-জাতির ভাগ্য থেকে কালো যবনিকা হ'ল অপসারিত!...

পরবর্তীকালে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে রুশবাসীরও ভাগ্যচক্র হ'ল পরিবর্তিত,—জুলুম এবং নিগ্রহের পরিবর্তে রুশ-নেতারা একটা শান্তিপূর্ণ আপস-রফা এবং বুঝাপড়ার নীতিকেই অধিকতররূপে মেনে নিলেন।—ক্রুশেভ সহাবস্থান-নীতির উপযোগিতা স্বীকার করলেন। ···

এক ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে এবং হস্তক্ষেপের ফলে যে হিটলার-নিধন এবং জার্মানীর পরাজয় সম্ভব হয়েছিল তা তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি বিজয়লাভের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন-–

"The house desired to offer thanks to Almighty God, to the great Power which seems to shape and design the fortunes of nations and the destiny of man...Thanks to Almighty God for our deliverance from the threat of German domination."

— Winston Churchil.

ডানকার্ক থেকে বিজয়ী এবং পরাক্রমী হিটলার-সেনার সেই পশ্চাদপসরণ এখনও জগদ্বাসীর কাছে এক গভীর বিস্ময় এবং হেঁয়ালিস্বরূপ হ'য়ে আছে।—যে-হিটলার বিজয়মদে উন্মত্ত হ'যে অমিত বিক্রমে এগিয়ে চলেছিল ইংলণ্ড-বিজয়ের পথে, সে-হিটলার ডানকার্ক থেকে কেন অকস্মাৎ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো ?—এর কোনো হেতু মানুষের মন-বুদ্ধি আজও খুঁজে পায়নি। মানব-মন এসত্য বুঝতে অক্ষম যে, অধ্যাত্মশক্তি-প্রভাবে সবই বানচাল হ'য়ে যায়, কারণ এ শক্তি সেই সর্বনিয়ন্তারই শক্তি। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন সুদৃঢ় ভাষায় :–

"আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে ; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে আছে এমন জ্ঞান এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে ইওরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি উড়ে যেতে পারে।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটাবার জন্য ভারতের সেই অমোঘ অধ্যাত্মশক্তিই প্রয়োগ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ !···এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ ভারত-সন্তানকে তার ঋষি-পিতামহের জ্ঞানে এবং ধর্মে উদ্বুদ্ধ হ'তে বলেছেন পরধর্ম পরিহার ক'রে। কারণ সেই জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত আছে ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, তার শক্তি ও গৌরব।—কিন্তু ভারতের নেতৃবৃন্দ সেদিকে দৃষ্টি না-দিয়ে

ভারত-গঠনে প্রয়াসী হলেন পর-ধর্ম ও পরনীতিকে আশ্রয় ক'রে, যার ফলে ভারতের বুকে আজ এত গলদ, ভারত-সন্তান আজ দিশাহারা !···অতিমানস-দিশারী শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা এবং নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে আমাদের নেতারা দেশের মহা অনিষ্ট সাধনই ক'রে চলেছেন--ক্রীপ্‌স্‌-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হ'তে শুরু ক'রে। কিন্তু আজ দেশের কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং নমনীয়-স্বভাবের যুব-সম্প্রদায় শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনা ও শিক্ষার প্রতি অবহিত এবং মনোযোগী। এটা দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ। কিন্তু যতক্ষণ না রাজশক্তি প্রয়াসী হ'চ্ছে ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানকে সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে ততক্ষণ ভারতের সুমহান্ ব্রত সংসিদ্ধ হবে না। তাই ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন ১৯৫৮ সালে শ্রীমাকে দর্শন করতে পণ্ডিচেরী-আশ্রমে এসেছিলেন তখন শ্রীমা রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলেছিলেন— "India must rise to the highest height of her mission." অর্থাৎ ভারতকে উত্থিত হ'তে হবে তার আদর্শের চরম উচ্চতায়! এই ব্রত সাধনের জন্য প্রথমে ভারতের কর্ণধারগণকে তথা নেতৃবৃন্দকে অধ্যাত্মজ্ঞানে হ'তে হবে সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: ভারত-নেতাদের জীবনকে গঠন করতে হবে গীতা-বর্ণিত নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনায় পরিপূর্ণরূপে। তবেই তাঁদের দ্বারা ভারত-জননীর যোগ্য সন্তানরূপে কর্মসম্পাদন হবে সম্ভবপর।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শেষ জীবনে ভেবে দেখেছিলেন যে, তাঁর দেশবাসীকে তথা সমগ্র জগদ্বাসীকে তাঁর যা দেবার তা তিনি পরিপূর্ণরূপে দিয়েছেন তাঁর লেখনী এবং তপস্যার মাধ্যমে। যে অতিমানসশক্তিকে পূর্ণভাবে অর্জনের জন্য তাঁর একান্তবাস, আভ্যন্তরীণ সত্তায় ও চেতনায় সে-সিদ্ধি তিনি অর্জন করেছেন পূর্ণরূপে এবং জাগতিক ক্ষেত্রে সে-শক্তি প্রয়োগ ক'রে তার ফলও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।—স্বীয় দিব্য আধারের মাধ্যমে এই পৃথ্বীভূমিতে শ্রীঅরবিন্দের যা করবার এবং মানব-সমাজকে যা দেবার ছিল তা তিনি করেছেন এবং দিয়েছেন সমগ্রভাবে। এখন তিনি বুঝলেন: পার্থিব-চেতনার রূপান্তর সাধনের জন্য স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহে তিনি কাজ করতে পারবেন আরও অমোঘ এবং অব্যর্থরূপে—স্থূলের বাধামুক্ত হ'য়ে। তাই ভগবান তাঁর মরদেহ ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলেন শ্রীমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।···

ক্রমে এগিয়ে এল সেই ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ,—সেই মৃত্যুঞ্জয়ী দিব্যপুরুষের দেহ-বিসর্জনের সাল। তাঁর এই সংকল্পের বিষয় সাধকদের কাছে রইলো

গোপন। তবুও তার ইঙ্গিত প্রচারিত হয়েছিল এক জ্যোতিষীর গণনায়। এবিষয়ে শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেছিলেন—"জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কিছু সত্য আছে বৈ কি"!…প্রশ্নকর্তা তাতে বিস্মিত হয়েছিলেন।…তবুও করুণাময় শ্রীঅরবিন্দ এ সত্য বুঝেছিলেন যে, অকস্মাৎ তাঁর মহাপ্রয়াণে আশ্রমবাসী তথা তাঁর ভক্তেরা হবে মুহ্যমান! তাদের জীবনে দেখা দেবে অবসাদ ও হতাশা—"Jepression and despondency." সাধকের জীবনে এই ভাবগুলো বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব। তাই এই দানব-দু'টির নিধন-সাধন প্রয়োজন।—এই সত্য বুঝলেন মা-শ্রীঅরবিন্দ; তাঁরা ঘোষণা করলেন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের বিজয়া-দশমী দিনে। নিম্নোদ্ধৃত ঘোষণাটি সেদিন আশ্রমে নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল ঃ—

Vijaya—1950

"It is the devil of depression and despondency that we shall slay tonight—so that all those who have the sincere will to get rid of this disease will receive the necessary help to conquer."

—The Mother and Sri Aurobindo

অর্থাৎ—"অদ্য রাত্রিতে আমরা অবসাদ ও হতাশারূপী দু'টি দানবকে বধ করবো—সুতরাং এই ব্যাধি হ'তে যারা সত্যিই মুক্তি পেতে চায় তারা যথা প্রয়োজন সাহায্য পাবে বিজয় অর্জনের জন্য।"—শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ।

আশ্রমের সাধক-সাধিকারা এই বাণী পেয়ে তখনও বুঝতে পারলেন না ঃ মা এবং শ্রীঅরবিন্দ কেন ঐ দুইটি দানব-বধের সংকল্প গ্রহণ করলেন।—সাধকদের মনে কিসের অবসাদ, কিসের হতাশা জাগবে ?…

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রায় তিরিশ বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দের কোনো ফটো গ্রহণের অনুমতি ছিল না। ১৯৫০এ, এপ্রিল মাসে ফ্রান্স থেকে একজন ফটোগ্রাফার এলেন পণ্ডিচেরী-আশ্রমে। মা-শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে অনুমতি দিলেন তাঁদের এবং আশ্রমের সব ফটো নেবার। প্রায় তিরিশ বছর পরে আশ্রম-বাসীরা করুণামূর্তি শ্রীঅরবিন্দের ফটো পেয়ে হ'ল ধন্য এবং তৃপ্ত। সুদীর্ঘকাল পরে ভক্তবৃন্দকে তাঁর শেষ জীবনের আলোকচিত্র দেওয়ার এই করুণা কেন, তাও তখন কেউ বুঝতে পারলো না।…পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাঁর স্থূলদেহ-ত্যাগের, তাই তিনি তাঁর করুণামূর্তিকে চির-জাগরূক

রেখে যেতে চান বিশ্ববাসীর স্মৃতিতে। এই গূঢ় উদ্দেশ্যেই পূর্বাহ্নে এইসব আয়োজন।...

যুগ-প্রয়োজনে পরাৎপর পরমেশ্বর যখন মানবদেহে অবতীর্ণ হ'ন তখন তিনি আসেন ঠিক এই মর্তের মানুষেরই মতো হ'য়ে।—মানুষের ভুল-ভ্রান্তি-বিস্মৃতি, দুঃখ কষ্ট, ব্যাধি-যন্ত্রণা সবই তিনি বরণ করেন।—সে-সবকে নিজে আস্বাদন ক'রে, তা থেকে পীড়িত মানুষকে করেন ত্রাণ। তাই অবতার-পুরুষকে বলা হয় ত্রাণকর্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ বরণ করেছিলেন ক্যানসার-রোগ দেহত্যাগের পূর্বে। শ্রীঅরবিন্দও সেই উদ্দেশ্যে মেনে নিলেন মূত্রকৃচ্ছ্র ব্যাধি। এর পূর্বে অনেকবার তিনি যোগবলে নিজে ব্যাধিমুক্ত হয়েছেন। সব সিদ্ধিই ছিল তাঁর করতলগত। একাদিক্রমে তিনি চল্লিশ বছর ধরে পণ্ডিচেরী-সাধনাশ্রমেই বাস করেছেন, অথচ প্রয়োজনবোধে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহে স্থান হ'তে স্থানান্তরে করেছেন ভ্রমণ! এমনও শোনা যায় যে, কুম্ভমেলায় সাধুগণ দেখেছেন শ্রীঅরবিন্দকে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ষ্ট্যালিনগ্রাডের অতীব সঙ্কট মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন।...কিন্তু সেবার তিনি তাঁর যোগবলে রোগারোগ্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কারণ তিনি গ্রহণ করেছেন দেহত্যাগের স্থির সিদ্ধান্ত ভক্ত-বৃন্দের অগোচরে।—১৯৫০এ, ২৪শে নভেম্বর তারিখেও তিনি সমবেত ভক্তদের দর্শনদান করলেন পূর্বপ্রথা মতো; কাউকে জানতেই দিলেন না তাঁর দেহকষ্ট।...এই দর্শনই তাঁর শেষ দর্শনদান ভক্তবৃন্দকে।

তাঁর মূত্রকৃচ্ছ্রব্যাধি ক্রমে এগিয়ে চল্‌লো বৃদ্ধির দিকে। তিনি কিন্তু সেই রকমই উদাসীন,—চেতনা তাঁর স্থির নিবদ্ধ পরাভূমিতে, সেই অতিমানস-লোকে।...শ্রীমা কিন্তু সবই জানেন, তবুও তিনি ব্যবহারিকরূপে ব্যবস্থা করলেন শ্রীঅরবিন্দের চিকিৎসার। কলকাতায় তাঁর ভক্তশিষ্য ডাক্তার প্রভাত সান্যালকে তিনি টেলিগ্রাম ক'রে পণ্ডিচেরী আনালেন শ্রীঅরবিন্দের চিকিৎসার জন্য। তাঁর দিব্যদেহে কী চিকিৎসা করবেন তাঁরা?..পরিবেষ্টিত ভক্তেরা আকুলভাবে শ্রীগুরু-চরণে নিবেদন জানালেন,—তাঁকে প্রশ্ন করলেন—কেন তিনি রোগমুক্তির জন্য তাঁর যোগশক্তি প্রয়োগ করছেন না?...পরম পিতা কিন্তু সেই রকমই উদাস, নির্লিপ্ত!—তিনি শুধু বললেন—"এ তোমরা বুঝবে না।"...ভক্তেরা নিরুপায়!...

এল পয়লা ডিসেম্বর। আশ্রম-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎসব—নাচ-গান ইত্যাদি হ'ল শুরু। খেলার মাঠে ছেলে-মেয়েরা তাদের সমবেত ড্রিল এবং নানা ধরণের খেলাধূলা দেখালো ২রা ডিসেম্বর বৈকালে।—এল

৩রা ডিসেম্বর। এই গ্রন্থের লেখক সেদিন সন্ধ্যার পরও শ্রীমাকে প্রণাম ক'রে মার কাছ থেকে পেল তার জন্মদিনের আশীর্বাদ এবং পুষ্পস্তবক। শ্রীঅরবিন্দ যেন এবার হ'লেন তৃপ্ত—স্কুলের সমাবর্তন-উৎসব আশ্রমবাসীরা আনন্দের সহিত সমাপন করায়।...তারপর এল ৪ঠা ডিসেবর। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, শুরু হ'ল ৫ই ডিসেম্বর। ৫ই ডিসেম্বর এল : কোন্ মহা বিস্ময় এবং মর্মঘাতী বাণী নিয়ে? নিদ্রিত আশ্রমবাসীর নিকট তখনও তা' অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! 'ইউরিমীয়া-কমায়' তখন শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানরহিত। চেতনা তাঁর নিবদ্ধ সেই জ্যোতির্ময় অতিমানস-লোকে।

৫ই ডিসেম্বর প্রাতঃ প্রায় আট ঘটিকার সময় এই লেখকের আশ্রম-আবাসে একটি আশ্রম-বালক অশ্রুসজল চোখে উপস্থিত হ'য়ে বললো—"গত রাত্রে শ্রীঅরবিন্দ ১টা ২৩ মিনিটে দেহত্যাগ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের কক্ষদ্বার শ্রীমা আশ্রমবাসীদের খুলে দিয়েছেন শ্রীগুরুর দিব্যদেহ দর্শনের জন্য!...এই অপ্রত্যাশিত, অকল্পনীয় সংবাদ হৃদয়ে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করলো! আমি মর্তে কি শূন্যে তা তখন বুঝতে পারলাম না। ক্ষোভ এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা অবশভাবে ছুটলাম মুখ্য আশ্রমের দিকে।—দর্শনার্থীর সারি শুরু হ'য়ে গিয়েছে,—চলেছে উর্ধ্বঅভিযান দোতলায় শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য আবাস অভিমুখে। শ্রীভগবানের কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে যে অভূতপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য সামনে দেখলাম তাতে সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ এক পরম তৃপ্তিতে, বিস্ময়ে ও আনন্দে ভ'রে গেল।...দর্শনদিনে মা-শ্রীঅরবিন্দের দিব্য যুগলমূর্তির দর্শন পেয়েছি,—পেয়েছি তাঁদের যুগ্ম পুণ্যস্পর্শ ও আশীর্বাদ। কিন্তু সেদিন শ্রীঅরবিন্দের দিব্যবপুর যে-দৃশ্য দেখলাম, যে-স্বর্গীয় দর্শন অদৃষ্টে ঘটলো তা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না—অবাঙ্‌মনসোগোচর সে অনুভূতি!...যে যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি শ্রীঅরবিন্দ স্বীয় দেহে বরণ করে তাঁর দিব্য-দেহ বিসর্জন দিলেন, যার ডাক্তারী-নাম 'ইউরিমিয়া কমা', তার বিষক্রিয়ায় ব্যাধিগ্রস্ত দেহ হ'য়ে যায় কালিবর্ণ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দেহ হ'ল তার বিপরীত—দিব্যদেহ হ'ল স্বর্ণজ্যোতিতে ভাস্বর! তিনি যেন ব্যাধিরূপী কৃষ্ণনাগের রূপান্তর সাধন ক'রে স্বয়ং নারায়ণ-রূপে শায়িত রয়েছেন অনন্তশয্যায়; তাঁর সারা কক্ষটি এক জ্যোতির্ময় পরিবেশ এবং প্রশান্তিতে পূর্ণ!—অতিমানস লোক হ'তে বিচ্ছুরিত দিব্যদ্যুতি তাঁর মরদেহে উদ্ভাসিত, স্থূলদেহে অতিমানস-জ্যোতির প্রথম বিকাশ যেন সূচিত করছে তার পূর্ণ অবতরণের সম্ভাবনা এই পৃথিবীর বুকে!—মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ তাঁর দিব্যদেহ বিসর্জন দিয়ে যেন অর্জন করলেন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার চরম ও

পরম সিদ্ধি,—অতিমানস-জ্যোতিঃদ্বার উন্মুক্ত ক'রে গেলেন তিনি! বেদে বর্ণিত উপাখ্যানস্বরূপ—এই পৃথিবীতে নবসৃষ্টির মহাযজ্ঞে দেবতারা যেন সেই পরাৎপর পুরুষকে বলির পশুরূপে বন্ধন করলেন যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য। সপ্ত পরিধি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের আর সেই যজ্ঞের সমিধ ত্রিসপ্ত—

"সপ্তাস্যাসন পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তনবানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥

* * *

শ্রীমা ঘোষণা করলেন: অতিমানসজ্যোতিঃ শ্রীঅরবিন্দের দেহকে ঘিরে রয়েছে। এই জ্যোতি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ দিব্যদেহকে সমাধিস্থ করা হবে না।—

ডাক্তার প্রভাত সান্যাল মায়ের এই কথা শুনে বললেন—"কই, মা, আমি তো কোনো জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি না।" মা তখন তাঁকে বল্‌লেন—"তুমি দেখতে চাও?" - এই ব'লে মা তাঁর করতল দিয়ে ডাঃ সান্যালের মস্তকে চাপ দিলেন। সান্যালের দিব্যদৃষ্টি গেল খুলে। তিনি যা দেখলেন তাতে তিনি অভিভূত এবং স্তম্ভিত হলেন, তাঁর জীবন হ'ল সার্থক সেই অলৌকিক দর্শনে।

অতিমানসদ্যুতি সেই দিব্যদেহকে সজীব ও জ্যোতির্ময় রাখলো প্রায় পাঁচটা দিন।—ডাক্তারী পরীক্ষায় সেই দেহে মৃত্যুর কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না—দেহ থেকে প্রাণবায়ু নির্গত হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও; দেহ সম্পূর্ণ সজীব! শ্রীঅরবিন্দের সেই দিব্যদেহ দর্শন-মানসে দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে এল ভক্তবৃন্দ সংবাদ পেয়ে। প্রতিদিন তিনবার ক'রে—প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সায়াহ্নে আশ্রমবাসীরা এবং বহিরাগত ভক্তেরা পেতে থাকলো সেই দিব্যদর্শন।·· ভক্তেরা মনে আশা পোষণ করতে থাকলো—হয় তো বা শ্রীঅরবিন্দের পুনরভ্যুত্থান ঘটবে এই দেহে।—এমন সময় শ্রীঅরবিন্দের অশরীরী আত্মা মাকে বল্‌লেন—মায়ের প্রশ্নের উত্তরে—

"I have left this body purposely. I will not take it back. I shall manifest again in the first Supramental body built up in the Supramental way."

অর্থাৎ—এ-দেহ আমি প্রয়োজনেই ত্যাগ করেছি। এ-দেহে আমি আর ফিরে আসবো না। আমি পুনরায় আবির্ভূত হবো প্রথম অতিমানবদেহে—যে-দেহ গঠিত হবে অতিমানস-জ্যোতির বিধানে।—

পাঁচ দিনের দিন অর্থাৎ ৯ই ডিসেম্বর বৈকালে মা দেখলেন তুরীয় জ্যোতি ক্রমে আসছে ক্ষীণ হ'য়ে।—মা তখন সেই দিব্যদেহকে সমাধিস্থ করবার দিলেন নির্দেশ। ভিতরে রৌপ্যের আস্তরণ দিয়ে রোজ-উডদ্বারা একটি সুন্দর শবাধার নির্মিত হ'ল। সেই শবাধারে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যবপু শায়িত রেখে আশ্রমের সাধকগণ পবিত্র শবাধারটিকে স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে এলেন আশ্রম-প্রাঙ্গণে নির্দিষ্ট স্থলে সমাধিস্থ করবার জন্য। মায়ের নির্দেশ পেয়ে পূর্বেই সাধকগণ উক্ত নির্দিষ্ট স্থলে গভীর সমাধি খনন ক'রে সিমেণ্টের ব্লক দিয়ে সমাধিগাত্র গেঁথে রেখেছিলেন, সমাধিতলও সিমেণ্ট-কংক্রীট করা হয়েছিল। সেই সুনির্মিত সমাধি-গহ্বরে সযত্নে রক্ষিত হ'ল শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র শবাধার। সেই সমাধি-গহ্বরের কয়েক ফুট উপরে সিমেণ্টের স্ল্যাবদ্বারা আচ্ছাদন দেওয়া হ'ল। তার উপর আর একটি কক্ষ নির্মিত হ'ল। এই কক্ষটি তখন সিমেণ্টের তক্তা ঢাকা দিয়ে খালি রাখা হ'ল। (১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে নভেম্বর এই খালি কক্ষটিতে শ্রীমায়ের শবাধার রক্ষিত হয়েছে তার উপর সিমেণ্টের তক্তা ঢাকা দিয়ে।) এই খালি কক্ষটির উপর তখন আর-একটি কক্ষ নির্মিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের শবাধার সমাধিস্থ ক'রে সাধকগণ উপরিস্থিত সেই খালি কক্ষটি পূর্ণ করেন তাঁদের ভক্তি-অর্ঘস্বরূপ মৃত্তিকা অর্পণ ক'রে। সেই হ'তে সমাধির উপরিভাগে নিত্য নানাবিধ পুষ্পে নব-নব সজ্জায় সজ্জিত করা হয় প্রতি প্রত্যূষে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর হ'তে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পরিণত হ'ল জাগ্রত মহাতীর্থে। পুরুষোত্তমের দিব্য সমাধির উপর পুষ্পার্ঘ অর্পণ ক'রে সমাধির পবিত্র স্পর্শে ধন্য এবং কৃতার্থ হয় ভক্তের জীবন, সমাধি-প্রণামে তৃপ্ত হয় তাদের দেহ-মন-প্রাণ ; তাপিত তৃষিতজন লাভ করে তাদের প্রাণে পরম সান্ত্বনা।

বিশ্বকবির বাণীতে হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে—

> "সেই সাধনার সে-আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
> হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

বরেণ্য কবির হৃদয়োত্থিত সেই প্রার্থনার 'যজ্ঞশালা'র দ্বার আজি খোলা পণ্ডীচেরীর পুণ্যতীর্থে…যেখানে সবাই মিলিত হ'চ্ছে 'আনতশিরে'।

পৃথ্বীভুমিতে অতিমানস-আলোকের অবতরণ

যে অতিমানস-আলোক ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বরের প্রথম-প্রভাতে তিমানস-লোক থেকে নেমে এসে সর্বপ্রথম আলোকিত করলো শ্রীঅরবিন্দের ব্যদেহকে, প্রাণহীন সেই মর-আধারকে সঞ্জীবিত রাখলো প্রায় পাঁচদিন য্যাতির্ময় দেহরূপে তা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে। —শ্রীমা তাঁর তপস্যাদ্বারা ই নবজ্যোতির পূর্ণ অবতরণ ঘটালেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারি রিখে এই পার্থিব চেতনায়। এই মহাব্রত উদ্‌যাপন ক'রে শ্রীমা ঘোষণা রলেন সুস্পষ্ট ভাষায় :—

February 29 to March 29, 1956

"Lord, thou hast willed and I execute :
A new Light breaks upon the earth,
a new world is born.
The things that were promissed are fulfilled."

—The Mother

অর্থাৎ—"এক নূতন আলোক পৃথিবীতে নেমে এল,
এক নূতন জগৎ জন্মলাভ করলো,
যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা' হ'ল পূর্ণ।"

যে ঘোষণা একদিন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা-ই আজ সফল হ'ল পার্থিব লাকে। অতিমানস-দিশারী শ্রীঅরবিন্দের দিব্য ইচ্ছাকে পূর্ণ করলেন তাঁর রাশক্তি শ্রীমা। এ বিষয়ে শ্রীমা বলেছেন :

"The gates of Supramental have been thrown open and he Supramental consciousness, Light and Force are flooding he earth".

পুরুষোত্তম তাঁর সব দিব্য ইচ্ছাকে রূপায়িত ক'রে থাকেন তাঁরই ঐশীশক্তির মাধ্যমে। এই কলিযুগের শেষে পুরুষোত্তম এবং তাঁর পরাশক্তি মানবদেহে অবতীর্ণ হ'য়ে, যুগ-প্রয়োজনে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেলেন র্বজয়ী অতিমানস জ্যোতিঃকে। এই নবজ্যোতিঃ এখন আমাদের স্থূলদৃষ্টির অগোচরে সক্রিয় রয়েছে—flooding the earth. পৃথিবীর, এমন-কি তার নিশ্চেতন ক্ষেত্রেও পুঞ্জীভূত সব অশুদ্ধি এবং গ্লানিকে মুছে ফেলে, বিধিনির্দিষ্ট

সময়ে এই মর্ত্যলোকে স্বর্গলোক সৃষ্টির জন্য।—আমরা যদি এই সত্য উপলব্ধি ক'রে, সেই নবালোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত রেখে জগন্মাতার যন্ত্ররূপে তাঁর কর্মে অবতীর্ণ হ'তে পারি তবে মায়ের লীলাসাথীরূপে তাঁর দিব্যলীলাকে আমরা সার্থক ক'রে তুলবো,—এই পৃথিবীতে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠায় আমরা হবো মায়ের সহায়।—পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীকে তাঁর দিব্য কর্মের সহায়রূপে পাওয়ার জন্য দিব্য-জননী রয়েছেন অপেক্ষানিরতা।

এই পার্থিব-চেতনায় মানসলোক থেকে মনসৃশক্তির অবতরণের ফলে যেমন মনোময় জীব—মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তেমনি অতিমানসলোক থেকে অতিমানস-শক্তির অবতরণের ফলে এই মানবদেহ রূপান্তরিত হ'য়ে পরিণত হবে অতিমানবরূপে। এই অতিমানব সজ্ঞানে সদা বহন ক'রে চলবে সচ্চিদানন্দঘন মূর্তিকে তার হৃদয়ে। হৃদিস্থিত সেই সচ্চিদানন্দেরই দিব্য ইচ্ছায় তার প্রতিটি কর্ম হবে নিয়ন্ত্রিত। এই মানব আধারই তখন রূপান্তরিত হ'য়ে পরিণত হবে: শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত 'জগন্নাথের রথে'। এই অতিমানবগোষ্ঠী বিজয় অর্জন করবে সব সত্যবিরোধী শক্তির উপর।—সৃষ্টি করবে এই মর্ত্যভূমিতেই চির-আনন্দ, চির ঐক্য, শান্তি, সত্য এবং সমৃদ্ধির রাজ্য সব বিভেদকে ঘুচিয়ে।—বিশ্বজননী এই পৃথ্বীভূমি-সৃষ্টির দিব্য ইচ্ছা তবেই হবে পূর্ণ। অতিমানব-আধারের এই জগন্নাথের রথ তখন জগন্নাথের মন্দির-নগরীর পথে বাহির হবে দশদিক আলোকিত ক'রে। কিন্তু, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—তার পূর্বে মানুষকে, মনোময় পুরুষকে হ'তে হবে তার প্রকৃতির 'সাক্ষী অনুমন্তা ঈশ্বরঃ'। তাকে পূর্ণরূপে উন্নীত হ'তে হবে খাঁটি মানবীয় পর্যায়ে তার নিম্নপ্রকৃতির সব প্রভাবমুক্ত হ'য়ে।—তাকে অর্জন করতে হবে পূর্ণ অধ্যাত্মসিদ্ধি।—জীবনকে গঠন করতে হবে একমাত্র তার অন্তরাত্মার সত্যের ধর্মে, সব অহংকে বর্জন ক'রে। তবেই মানুষ অতিমানসসিদ্ধি-অর্জনের যোগ্যতা করবে লাভ। কিন্তু মানুষের চেতনায় এতটুকু অহং থাকতে সে-সিদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না। শ্রীঅরবিন্দ তা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"The Supermind coming down on earth will chan[ge] nothing in a man if he clings to the ego."

শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন, অতিমানসের অবতরণ বস্তুসমূহের পরিবর্তন ত্বরান্বিত করবে বটে, কিন্তু তা জগতে পেটেন্ট ওষুধের মতো কাজ করবে বা চক্ষের পলকের মধ্যেই সব-কিছু বদ্‌লে দেবে না। শ্রীঅরবিন্দের

ভাষায়: "The descent of the Supramental can hasten things, but it is not going to act as a patent universal medicine or change everything in the twinkle of an eye."

"মানুষীং তনুং আশ্রিত" হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দ যে যুগ-সত্য প্রকাশ ক'রে ধরেছেন, সে-বিষয়ে শ্রীমা বলেছেন: "শ্রীঅরবিন্দ মানুষী তনুতে মূর্ত ক'রে ধরেছেন অতিমানস-চেতন, আর সেই সাধনপথের প্রকৃতি, ধারা ও লক্ষ্য-সিদ্ধির উপায় কেবল আমাদের কাছে প্রকাশ ক'রে ধরেছেন তাই নয়, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধি দিয়ে আমাদের কাছে প্রমাণ করেছেন, তুলে ধরেছেন এমন এক দৃষ্টান্ত যে তাঁর এই ব্রত সাধন করা অবশ্যই প্রয়োজন এবং তার সময় এখনই।"

* * *

"পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের যা অবদান তা কোনো তত্ত্বশিক্ষা নয়, এমন কি কেবল সত্যের প্রকাশও নয়, তা হ'ল এ জগতের উপর পুরুষোত্তমের এক প্রত্যক্ষ চূড়ান্ত ক্রিয়া।"

শ্রীমা তাঁর মহাপ্রয়াণের কয়েক বছর পূর্বে ঘোষণা ক'রে গেছেন:—

"The moment is approaching when the world will be governed by truth. Will you work to hasten its coming?"

অর্থাৎ—"এমন সময় এগিয়ে আসছে যখন এই জগৎ শাষিত হবে সত্যের বিধানে। সেই শুভ আগমনকে ত্বরান্বিত করবার জন্য তুমি কি কর্মে অবতীর্ণ হবে?"

মায়ের উক্ত বাণীতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই পৃথিবীতে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মা চান পৃথিবীর মানব-সমাজকে কর্মে অবতীর্ণ হ'তে—ভাগবতী জননী মানুষকে চান: তাঁর দিব্যলীলার লীলাসাথীরূপে পেতে।...

যে বিশ্বজননী অসীম করুণা ক'রে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন পৃথিবীর এই মানুষের মাঝে ঐক্য, শান্তি, আনন্দ এবং ভগবৎ প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোপরি শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃত স্বরূপ এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ ক'রে ধরলেন সমগ্র বিশ্বে, সেই দিব্যজননীর শ্রীচরণে প্রণতি, ভক্তি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে আমার এই গ্রন্থের সমাপ্তি টানছি মায়ের স্তবগান গেয়ে।

"Open to Sri Aurobindo's consciousness and let it transforr your life."

* * *

"Sri Aurobindo is always present.
Be sincere and faithful.
This is the first condition."—The Mother

"শ্রীঅরবিন্দের চেতনার প্রতি নিজেকে খুলে ধরো এবং এই চেতনাকে দাও তোমার জীবনকে রূপান্তরিত করতে।

শ্রীঅরবিন্দ সর্বদা সর্বত্র অধিষ্ঠিত রয়েছেন।
বিশ্বস্ত এবং অকপট হও।
এই হ'ল প্রথম সর্ত। —শ্রীমা

* * *

একদিন তিনি অবশ্যই অবতীর্ণ হবেন জীবনে এবং পৃথিবীতে,
অনন্তের দ্বারগুলির সব গোপন রহস্যকে ফেলে রেখে এসে,—
এমন জগতের মাঝে তিনি নেমে আসবেন, যে-জগৎ
চীৎকার ক'রে ক্রন্দন করছে তাঁর সাহায্যের জন্য,
এবং সেই পরম সত্যক নিয়ে আসবেন
যা পঞ্চভূতে-বদ্ধ আত্মাকে দেবে মুক্ত ক'রে,
নিয়ে আসবেন আত্মার দীক্ষার সেই আনন্দকে,
প্রেমের প্রসারিত বাহুর সেই অজেয় শক্তিকে।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃস্তবাঞ্জলি

নমামি জননী, দেবী জগন্মাতা, জগত-পালিনী,—
ত্রিলোকতারিণী, মহেশ্বরী, মহামঙ্গলদায়িনী।
করুণারূপিণী, ভুবনমোহিনী,—তুমি সর্বেশ্বরী,
ধরণী-ভরণী, সুরেশ্বরী, তোমারে প্রণাম করি।

অসীম করুণা করি' তব পরাস্থিতি পরিহরি',
আসিলে নামিয়া তুমি মরতের এই ধূলি 'পরি—
ব্যথিত সন্তানে তব প্রদানিতে পরম সান্ত্বনা,—
অসুর-নির্জিত মর্ত্যমানবের ঘুচাতে বেদনা।···

জগৎ-জননী তুমি,—বিশ্ব-জনকের ভাগ্যসাথে
মিলেছিলে আসি––বিদূরিতে কালো আলোক-প্রপাতে—
এই মর্তবক্ষ হ'তে চিরতরে—হে, করুণাময়ী,—
নাশিছ কালের অরি—হানি' শক্তি তব জগজ্জয়ী !—

তব স্থূলদেহ-অন্তরালে এবে বিরাজিছ তুমি—
জ্যোতির্ময় দেহে তব—গ্লানিমুক্ত তরে পৃথ্বীভূমি।—
পরমা প্রকৃতি তুমি—মহামায়া, নবযুগেশ্বরী,
ত্রিলোকতারিণী, মহেশ্বরী, তোমারে প্রণাম করি।

পুরাতন সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ

"সাধারণ সাধকদিগের লক্ষ্য হ'চ্ছে : তুরীয় চেতনার সহিত (সৎ-চিৎ-আনন্দ) সংযোগ-স্থাপন। এবং যারা সেখানে পৌঁছয় তারা নিজেদের মুক্তি-অর্জনেই হয় সন্তুষ্ট, এবং এই জগৎকে তারা ত্যাগ ক'রে যায় তার 'অসুখৎ' অবস্থায় ফেলে রেখে। অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা শুরু হয়েছে সেইখান থেকে যেখানে অন্যদের সাধনা হয়েছে সমাপ্ত। একবার যখন সেই পরা-চেতনার সহিত একত্ববোধে প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছে তখন সাধকের অবশ্য কর্তব্য হবে সেই চেতনাকে বহির্জগতেও নামিয়ে আনা এবং পার্থিব জীবনের অবস্থাকে পরিবর্তিত ক'রে তোলা যতক্ষণ না এর পূর্ণ রূপান্তরসাধনলাভ হয় এই পৃথ্বীভূমিতে! এই লক্ষ্য সাধনের জন্য পূর্ণযোগের সাধকগণ এইজগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করে না—গভীর বিষয়ে অভিভূত থাকার জন্য এবং ধ্যানজীবন যাপনের জন্য। প্রত্যেককে, কমপক্ষে তার সময়ের এক তৃতীয়াংশও নিয়োগ করতে হবে প্রয়োজনীয় কাজে।"...

— শ্রীমা

পরিশিষ্ট

জগতের দুইটি বিশেষ ঘটনায় মানব-প্রগতি রক্ষায় শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মশক্তি-প্রয়োগ

শ্রীঅরবিন্দ জাগতিক ক্ষেত্রে—দুইটি বৃহৎ ব্যাপারে—তাঁর যোগশক্তি প্রয়োগ ক'রে আশানুরূপ ফললাভ করেছিলেন—

১। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের পরাজয় এবং নিধন-সাধনে।

২। জাপানের ভারত অধিকারের সংকল্পকে ব্যর্থ ক'রে।

ঐ যুদ্ধের সময় নাজীশক্তির মিত্র জাপান নেতাজী সুভাষের I. N. A. সৈন্যবাহিনীর সহায় হ'য়ে ভারত-অভিযান শুরু করে। কারণ সুভাষ বিশ্বাস করেন: জাপানের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনার সাহায্যে তিনি ভারতকে ব্রিটিশ-কবলমুক্ত ক'রে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবেন। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু তাঁর যোগদৃষ্টিতে জাপানের আসল মতলব বুঝতে পারেন। জাপান-পরিচালিত নেতাজীর সৈন্যবাহিনী যখন আসামের বনভূমিতে প্রবেশ করে তখন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে এমন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয় যে, সেই অঞ্চল তখন অথৈ জলের নীচে মগ্ন হয় এবং সেখানে শুরু হয় বন্যা। কতিপয় দিবস যাবৎ আসামের সেই অঞ্চল এইভাবে জলপ্লাবিত থাকে। সেই অপ্রত্যাশিত অবস্থায় আই. এন.এ-র আক্রমণকারী সেনা-বাহিনী এবং জাপানী সৈন্যরা ভারত-উদ্ধারের সংকল্প ত্যাগ ক'রে, সেই নিদারুণ সঙ্কটময় অবস্থা থেকে নিজেদের উদ্ধারের জন্য পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।·· আসামে সেই অসময়ে ঐরূপ প্রবল বর্ষণ এবং প্লাবন তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

I.N.A. মারাত্মক ভুল করেছিল: জাপানের সহায়তায় ভারত-উদ্ধারের আয়োজন ক'রে।—তখন যদি ব্রিটিশের পরাজয় ঘটতো জাপান-শক্তির কাছে, জাপান অনায়াসে ভারত দখল ক'রে নিয়ে সেখানে থাবা গেড়ে বসতো। জাপানকে তখন ভারত থেকে হটানো নেতাজীর সৈন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'ত। জাপান তখন এমন দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল যে ইউরোপের মিত্র-শক্তিও তার কাছে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল!—পার্ল হারবারে জাপানের নিকট ব্রিটিশের চরম পরাজয় তার প্রমাণ!—তাই ঐশীশক্তি ঘটালো সেই বিশ্বযুদ্ধে

১৮৭।৩ অলৌকিক

৫। পরাজয়-সাধনে।—মানবীয়-বোধে তা

২৮৩৩।—জাপান নিঃসন্দেহে এশিয়ার গৌরব। কিন্তু অপরের রাজ্য জয়ের লিপ্সা জাগায় এবং অত্যধিকরূপে প্রভুত্বকামী হওয়ায় তার এবং হিটলারের অতি উদ্ধত সামরিক শক্তির ঘটলো এই চরম পরিণতি !—অপরসব প্রভুত্বকামী দেশগুলিরও ভাগ্যে এই পরিণতি স্থিরীকৃত হ'য়ে আছে ঐশ্বরিক শক্তির বিধানে। কারণ এই পৃথিবীতে সমগ্র মানব-সমাজের মাঝে সার্বভৌম ঐক্য এবং শান্তি স্থাপনই বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তির ইচ্ছা।

জাপানের নূতন সাম্রাজ্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ ক'রে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন ঃ

Japan's imperialism being young and based on industrial and military power and moving Westward, was a greater menace to India than the British imperialism which was old, which the country had learnt to deal with and which was on the way to elimination". — Sri Aurobindo

অর্থাৎ—"জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নবীন এবং শিল্প ও সামরিকশক্তি-ভিত্তিক যা অগ্রসর হ'যে চলেছিল পশ্চিমাভিমুখে। এ শক্তি হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা অধিকতর ভীতিপ্রদ ভারতের পক্ষে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল পুরাতন এবং যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে ভারত অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল এবং যা এগিয়ে চলেছিল বিলুপ্তির পথে।"

শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের কর্ম এবং ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত ক্রম-পরিচয়

১৫ই আগস্ট—কলিকাতায় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাটীতে
১৮৭২ মাতা-পিতার তৃতীয় পুত্ররূপে শ্রীঅরবিন্দের জন্মগ্রহণ।

১৮৭৭-১৮৭৯—দার্জিলিংএ লরেটো কনভেণ্টে দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষারম্ভ।

১৮৭৯-১৮৮৪— ম্যাঞ্চেস্টারে ড্রুয়েট-পরিবারে শিক্ষার্থে শ্রীঅরবিন্দ।

১৮৮৪-১৮৯০— লণ্ডনে সেণ্টপলস্ স্কুলে সাহিত্যে বাটারওয়ার্থ পুরস্কার এবং ইতিহাসে বেডফোর্ড পুরস্কার অর্জন এবং কিংস কলেজের জন্ম উচ্চ স্কলারশিপ লাভ।

১৮৯০-.৮৯২— কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে ক্লাসিক্যালে প্রথম শ্রেণীতে ট্রাইপসে উত্তীর্ণ হন এবং আই-সি-এস পরীক্ষা পাস করেন, কি অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে উক্ত বিষয় এড়িয়ে যান।

৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩—ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং বরোদা-ষ্টেটের চাকুরীতে যোগদান।

৮৯৩-১৮৯৫—'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় 'নিউ ল্যাম্পস্ ফর দি ওল্ড' এবং আরো কয়েকটী মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৯৬— উর্বশী-কাব্য রচনা এবং ১৯১১ খ্রীঃ প্রকাশ।

১৯০·— রায়বাহাদুর ভূপাল বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীর পাণিগ্রহণ।

১৯০২— স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ-উদ্দেশ্যে বাংলার বিভিন্ন দলের সহিত সংযোগ-স্থাপন এবং শিক্ষিত যুবক-কর্মী সংগ্রহ আরম্ভ।

১৯০৫— বরোদা-কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পদে নিযুক্ত এবং ভবানীমন্দির রচনা ও প্রকাশ।

এপ্রিল, ১৯০৫—বরোদা-কলেজে অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষপদে।

১৯০৬ কলিকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে এবং 'বন্দে মাতরম' ইংরাজী দৈনিকের সম্পাদনায়।

ডিসেম্বর, ১৯০৬—দ দাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান।

জুলাই, ১৯০৭—বন্দে মাতরমে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গ্রেপ্তার এবং জামিনে খালাস। সেপ্টেম্বর মাসে পুলিসের সেই অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ঘটনাকে অবলম্বন ক'রেই রবীন্দ্রনাথের "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতা রচনা ও প্রকাশ।

২৬ ডিসেম্বর, ১৯০৭—সুরাট-কংগ্রেসে যোগদান এবং বিষ্ণুভাস্কর লেলের সহিত সাক্ষাৎকার।

২রা মে, ১৯০৮—মজঃফরপুরে বোমা-ঘটনার ফলে কলিকাতায় গ্রে ষ্ট্রীটে শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হন এবং ৫ই মে আলিপুর জেলে হন বন্দী। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ৬ই মে তিনি কারামুক্ত হন—মানিকতলা বোমা-মামলায় নির্দোষ প্রতিপন্ন হ'য়ে

৩০ মে, ১৯০৯—উত্তরপাড়ায় সুবিখ্যাত অভিভাষণ দান।

২৭ জুন, ১৯০৯—ইংরাজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগীন্' এবং বাংলা 'ধর্ম্ম' সাপ্তাহিক প্রকাশ।

১৯১০, ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত চন্দননগরে অজ্ঞাতবাস।

৩১ মার্চ, ১৯১০—পণ্ডিচেরী-উদ্দেশে চন্দননগর ত্যাগ এবং কলিকাতা হইতে রাত্রে 'ডুপ্লে' জাহাজে পণ্ডিচেরী যাত্রা।

৪ এপ্রিল, ১৯১০—বৈকালে পণ্ডিচেরীতে অবতরণ।

পণ্ডিচেরী মহাতীর্থে

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আগমনের কয়েক মাস পরেই প্যারিস হইতে দার্শনিক পল রিশারের পণ্ডিচেরী আগমন ও শ্রীঅরবিন্দকে আবিষ্কার, এবং মঁসিয়ে রিশারের মাধ্যমেই ঐ সনে শ্রীমায়ের শ্রীঅরবিন্দ-পরিচয় লাভ।

২৯ মার্চ, ১৯১৪—পণ্ডিচেরীতে শ্রীমায়ের প্রথম আগমন ও শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন।

১৫ আগস্ট, ১৯১৪—'আর্য' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ।

ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫—পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক প্রথম শ্রীমায়ের জন্মদিবস পালন।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫—শ্রীমায়ের পণ্ডিচেরী ত্যাগ—প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটন কারণে।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দেই 'অহনা' এবং অন্যান্য কবিতা রচনা

ডিসেম্বর, ১৯১৮—কলিকাতায় মৃণালিনী দেবীর দেহত্যাগ।

২৪এপ্রিল, ১৯২০—শ্রীমায়ের স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরী আগমন।

১৯২১—'লাভ এণ্ড ডেথ', 'দি ব্রেন অফ ইণ্ডিয়া', 'এ সিস্টেম অফ ন্যাশন্যাল এডুকেশন' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা।

১৯২২—'বাজীপ্রভু', 'এসেস অন দি গীতা' এবং 'স্পীচেস' গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

১৯২৬— এই সনের প্রথম দিকেই স্বীয় তত্ত্বাবধানে শ্রীমা-কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

২৪ নভেম্বর, ১৯২৬—শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধিদিবস্ উদ্‌যাপন।

১৯২৬, ২৪শে নভেম্বর হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রীঅরবিন্দের একান্তবাস।

২৩ নভেম্বর, ১৯৩৮—শ্রীঅরবিন্দের জানুতে আঘাতপ্রাপ্তি, সে-কারণে তাঁর একান্তবাসের নিয়ম-কানুনের কিছু ব্যতিক্রম শুরু।

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭—শ্রীঅরবিন্দের ৭৫তম আবির্ভাব-দিবসে ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

১৯৪৮—'সিন্‌থেসিস্ অফ যোগ' প্রথম প্রকাশ।

১১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮—সি, আর, রেড্ডি কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দকে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় পুরস্কার অর্পণ। এই উপলক্ষে মিঃ রেড্ডির শ্রদ্ধার্ঘ-বাণী এবং উত্তরে শ্রীঅরবিন্দের বাণী-প্রদান।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০—শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণ।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৫০—দিব্যদেহের মহাসমাধি।